তৃতীয় অধ্যায়

মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ

মহারাজা নিমির চারটি প্রশ্নের উত্তরে এই অধ্যায়টিতে মায়াশক্তির প্রকৃতি এবং কার্যপ্রণালী, মায়ার অপ্রতিরোধ্য কবল থেকে মুক্তিলাভের উপায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের দিব্যমর্যাদা এবং সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কর্মযোগ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

বদ্ধ জীবেরা যাতে ইন্দ্রিয় উপভোগ কিংবা বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সর্বকারণের কারণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে বদ্ধ জীবের পার্থিব শরীর গঠিত হয়ে থাকে। পরমাত্মারূপে আবির্ভূত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ঐসব বদ্ধ জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়াদি সচল রাখেন। ঐভাবে সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে বদ্ধ জীব নিজের স্বরূপ সত্ত্বা বলে ভুল ধারণা করে এবং তার ফলে নানা প্রকার ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে নিয়োজিত হয়ে থাকে। তার নিজেরই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ বাধ্য হয়ে সে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বারংবার জীবন ধারণ করে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। মহাপ্রলয় আসন্ন হলে, বিশ্বরূপের পরমাত্মা সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টিকে আপনার মাঝে প্রত্যাহার করে নেন, এবং তারপরে তিনি স্বয়ং সর্বকারণের পরম কারণসমুদ্রে প্রবেশ করেন। এইভাবে, শ্রীভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য সমন্বিত তাঁর মায়াশক্তিকে প্রভাবিত করেন যাতে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হতে পারে।

এই পার্থিব জগতে পুরুষ এবং নারীর কর্তব্যকর্ম অনুসারেই বদ্ধ জীবেরা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হয়ে থাকে। যদিও এই জীবেরা তাদের নানা দুঃখকষ্ট দূর করতে এবং তাদের সুখতৃপ্তি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে নিত্যনিয়তই সর্বপ্রকার জড়জাগতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, তা সত্ত্বেও অবিসম্বাদিত ভাবেই তারা ঠিক তার বিপরীত ফললাভই করে থাকে।

এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যেতে পারে না—পার্থিব গ্রহজগতেও নয়, কিংবা নানা যাগযজ্ঞসম্বলিত উৎসবাদি ও দানধ্যানের পরে উপলব্ধ পরজন্মে প্রাপ্ত কোনও স্বর্গলোকেও নয়। জীব মাত্রেই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে সর্বত্রই পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্বের ফলে বিব্রত হতেই থাকে।

তাই পার্থিব জীবনের দুঃখদুর্দশা থেকে চিরকালের মতো নিস্তার লাভে যে-মানুষ যথার্থই অভিলাষী, তাকে অবশ্যই কোনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, দীর্ঘকাল সযত্ন অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে অন্য মানুষদেরও মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই ধরনের যে সমস্ত মহান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা পরিহার করে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরই যথাযোগ্য সদ্‌গুরু বলে জানতে হবে।

সদ্‌গুরুকে মন-প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে নিয়ে, অনুগত শিষ্যকে তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়া শিখে নিতে হবে, যাতে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতিলাভ করেন। এইভাবে ভগবৎ ভক্তি অনুশীলনের পথ অবলম্বন করার ফলে, শিষ্য ক্রমশ সকল প্রকার সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ লাভ করতে থাকে।

শ্রীভগবানের বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দিব্য ক্রিয়াকলাপ, আবির্ভাব, গুণাবলী এবং পবিত্র নাম শ্রবণ, কীর্তন এবং মনন করতে হয়। মানুষ যা কিছু প্রীতিপ্রদ বা সুখময় দেখবে, তা সবই তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করতে হবে; এমন কি তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, গৃহ সম্পদ এবং প্রাণবায়ু পর্যন্ত সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলে অর্পণ করা উচিত। অন্য সকলের সেবা করতে হয় এবং অন্য সকলের পরামর্শও নিতে হয়। বিশেষত, যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁদের সেবা করা উচিত এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভক্তসঙ্গের মাঝে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের গুণকীর্তন করলে মানুষ তৃপ্তি ও সুখ লাভ করে এবং ভক্তমণ্ডলীর সাথে প্রেমময় সখ্যতা অর্জন করা যায়। এই ভাবেই সকল দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ যতপ্রকার পার্থিব ইন্দ্রিয় উপভোগের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা যায়। কোনও ভক্ত যখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পর্যায়ে উপনীত হন, তখন তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়, এবং তাঁর নানা প্রকার ভাবোল্লাসের লক্ষণাদি অভিব্যক্ত হয়; তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দিব্য পরমানন্দে উদ্ভাসিত হন। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ফলে, ভক্ত ক্রমে ভগবৎ-প্রেম আস্বাদনের পর্যায়ে উপনীত হন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি ভক্তিসেবা অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত হলে, অতিশয় দুরতিক্রমণীয় যে মায়াশক্তি ভক্ত তা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে যান।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়ের কারণস্বরূপ, তবু তাঁর নিজের প্রারম্ভিক কোনও কারণ নেই। অনিত্য অস্থায়ী এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে অধিষ্ঠিত থাকলেও, পরমেশ্বর ভগবান আপন নিত্যস্বরূপ এবং অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বেই বিরাজমান থাকেন। সাহায্য-সহায়হীন মন অথবা ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না, এবং স্থূল জড় পদার্থের উপস্থিতির মাধ্যমে সূক্ষ্ম কারণ ও স্থূল প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে জড় জগৎ প্রকাশিত হয় তার মাঝে তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তা হয়ে বিরাজিত থাকেন। যদিও মূলত তিনি এক, তবু তাঁর মায়াশক্তির বিস্তারের ফলে তিনি বিভিন্ন প্রকার বিবিধরূপে প্রকাশিত হন। তিনি নিয়তই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির প্রভাব মুক্ত থাকেন। তিনি পরমাত্মা স্বরূপ সকল জীবের মনস্ক্রিয়া সর্বব্যাপী সাক্ষীর মতো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তিনি পরম ব্রহ্ম এবং শ্রীনারায়ণরূপে সুবিদিত।

ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণকমলে যখন মানুষ গভীরভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে মানুষের কৃতকর্মের সকল ফলস্বরূপ তার অন্তরে পুঞ্জীভূত সর্বপ্রকার অপবিত্র বাসনাদির বিনাশ হয়। যখন এইভাবে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান এবং আপন আত্মিক সত্তাকে দিব্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত দেখতে পায়।

দিব্য বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য অনুশীলনের মাধ্যমে, মানুষ অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্মাদির তাৎপর্য, সেই সকল কর্তব্যে অবহেলার ফলাফল এবং নিষিদ্ধ কাজকর্মের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে শেখে। এই কঠিন বিষয়বস্তু কখনই জাগতিক জল্পনাকল্পনার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টি লজেন্স কিংবা মিছরী খেতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন যাতে সন্তানটি তার ওষুধ খেয়ে নেয়, তেমনই বৈদিক অনুশাসনগুলিও প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচরণমূলক ক্রিয়াকর্মের পরামর্শ দিয়ে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রণোদিত করে থাকে। যদি কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি পার্থিব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রলোভনকে জয় না করে থাকে এবং সে বৈদিক অনুশাসনাদিও পালন না করে, তা হলে অবধারিতভাবেই পাপকর্মাদি এবং অধর্ম আচরণে সে প্রবৃত্ত হতে থাকবে।

যখন ভক্ত তাঁর গুরুদেবের কৃপালাভ করেন এবং গুরুদেব তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি অভিব্যক্ত করেন, তখন ভক্ত তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিশেষ কোনও শ্রীবিগ্রহরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। এইভাবেই ভক্ত অচিরে সকল প্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে থাকেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্ ।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **পরস্য**—পরমেশ্বর; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ঈশস্য**—ঈশ্বর; **মায়িনাম্**—বিপুল মায়াশক্তির অধিকারী; **অপি**—এমন কি; **মোহিনীম্**—মোহযুক্ত; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **বেদিতুম্**—উপলব্ধি করতে; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **ভগবন্তঃ**—হে মুনিবৃন্দ; **ব্রুবন্তু**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—প্রবল মায়াশক্তির অধিকারী যোগীদেরও বিভ্রান্ত করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যে মায়া, সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে অভিলাষী হয়েছি। হে মুনিবৃন্দ, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে কিছু বলুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, এই অধ্যায়টিতে ঋষভদেবের বিভিন্ন ঋষিতুল্য পুত্রেরা মায়াশক্তি সম্বন্ধে, সেই মায়া অতিক্রম বিষয়ে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, এবং মানবজাতির বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্মাদি সূত্রে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—*বিষ্ণোর্মায়ামিদম্ পশ্যন্*—"কৃষ্ণভক্ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।" সেই কারণে নিমিরাজ এখন এই বিষয়বস্তুটি অনুধাবন প্রসঙ্গে ঋষিতুল্য যোগেন্দ্রগণের কাছ থেকে আরও বিশদ তথ্য পরিবেশনের আবেদন রাখছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, জগৎ পিতা শ্রীব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণ, এবং পৃথিবীর মানবজাতি সকলেই তাঁদের বিশেষ কামনা-বাসনার মাধ্যমে পার্থিব ইন্দ্রিয় উপভোগ বাঞ্ছা করে থাকেন। এই পার্থিব জ্ঞানের নিবিড় অনুসন্ধানের অভিমুখেই তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনা করে থাকেন। দেবতাদের সূক্ষ্ম স্বর্গীয় অনুভূতি এবং মানবজাতির স্থূল জাগতিক অনুভূতি নিয়ে সকলেই পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুগুলির পরিমাপ করতেই সদা ব্যস্ত থাকেন। মায়াশক্তি বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে বিমুখ করে রাখে বলেই জীব জড়জাগতিক নানা অভিপ্রকাশের মাঝে বিভ্রান্তির কবলায়িত হয়, নবযোগেন্দ্রবর্গের অন্যতম শ্রীঅন্তরীক্ষের কাছে সেই বিষয়ে নিমিরাজ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন।

শ্লোক ২

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্ ।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥ ২ ॥

ন অনুতৃপ্যে—আমি এখনও তৃপ্ত হইনি; **জুষন্**—যুক্ত হতে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **বচঃ**—কথায়; **হরিকথা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বিষয়ে; **অমৃতম্**—অমৃত; **সংসার**—পার্থিব সৃষ্টি; **তাপ**—দুঃখতাপে; **নিস্তপ্তঃ**—জর্জরিত; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **তৎ-তাপ**—সেই দুঃখবেদনা; **ভেষজম্**—ঔষধের চিকিৎসা।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বিষয়ে আপনার অমৃতবাণী আমি যদিও পান করছি, তবু আমার তৃষ্ণা এখনও তৃপ্তিলাভ করেনি। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কিত ঐ ধরনের অমৃতময় বিবরণী আমার মতো যারা জড়জাগতিক সৃষ্টির ত্রৈগুণ্যজনিত দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই সকল বদ্ধ জীবদের যথার্থ ঔষধি স্বরূপ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায়, যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি যেহেতু ইতিপূর্বেই বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই মানুষ পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লিখিত স্তরেই নিজের জীবনধারার সার্থকতা লাভ করতে পারে, তাই আর কোনও প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না।

তবে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তবিষয়ক *হরিকথামৃতম্* এমনই মনোরম এবং মাধুর্যময় যে, পারমার্থিক মুক্তি লাভের পরেও মানুষ তা শ্রবণ করা ত্যাগ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

"যাঁরা আত্মতৃপ্ত এবং বাহ্যিক জড়জাগতিক বাসনায় আকৃষ্ট নন, তাঁরাও অপ্রাকৃত গুণবিভূষিত ও বিস্ময়কর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেও আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ, কারণ তেমন অপ্রাকৃত দিব্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর রয়েছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/১০) কোনও ব্যাধির উপশম হয়ে গেলে পার্থিব ঔষধ প্রয়োগের আর প্রয়োজন হয় না, তবে দিব্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তার পরিণাম ভিন্নরূপ হয় না। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন ও গুণগান শ্রবণ উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দের সূচনা এবং পরম প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

নিমিরাজ সেই ঋষিবর্গকে তাই বললেন, "আপনারা সকলেই ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত মহান ঋষিবর্গ। সুতরাং আপনারা মায়াশক্তি সম্পর্কে যা কিছুই বলেন, তার সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভাবনার প্রসঙ্গ আসে। এই সব কিছুই আপনারা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কৃপা করে এমন চিন্তা করবেন না। আপনাদের উপদেশাবলীর ভাবসমৃদ্ধ অমৃতবাণী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সম্পর্কে শ্রবণে আমাকে পূর্বাপেক্ষা আকুল করে তুলেছে।"

নিমিরাজও মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তা না হলে নব যোগেন্দ্রবর্গের মতো মহাপুরুষদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপের কোনও প্রশ্নই উঠত না। তবে নম্র বিনয়ী বৈষ্ণব বলেই তিনি নিজেকে জড়জাগতিক উপাধি বিশিষ্ট এক অতি নগণ্য বদ্ধ জীব মনে করতেন। তাই পার্থিব অস্তিত্বের জ্বালাময়ী দুঃখাগ্নির মাঝে ভবিষ্যতে মায়া যাতে তাঁকে আবার নিক্ষেপের প্রচেষ্টা করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

শ্রীঅন্তরীক্ষ উবাচ

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ ।
সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

শ্রীঅন্তরীক্ষঃ উবাচ—শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন; **এভিঃ**—এই সকল (পার্থিব বিষয়াদির দ্বারা); **ভূতানি**—জীবগণ; **ভূত-আত্মা**—সকল সৃষ্টির পরমাত্মা; **মহা-ভূতৈঃ**—মহৎ-তত্ত্বের উপাদান সমূহের মাধ্যমে; **মহা-ভুজ**—হে মহান বলশালী রাজা; **সসর্জ**—তিনি সৃষ্টি করেছেন; **উচ্চ-অবচানি**—উচ্চ এবং নীচ উভয় প্রকার; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **স্ব**—তাঁর আপন অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আত্ম**—এবং আত্ম উপলব্ধি; **প্রসিদ্ধয়ে**—সিদ্ধিলাভের জন্য।

অনুবাদ

শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন—হে মহাবলশালী রাজা, পার্থিব উপাদানগুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে, সকল সৃষ্টির পরমাত্মা সমস্ত জীবকে উচ্চ এবং নীচ প্রজন্মগুলিতে প্রেরণ করেছেন, যাতে ঐ বদ্ধ জীবগণ তাদের অভিলাষ অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগ অথবা পরম মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিতে মায়া শক্তির জড়জাগতিক প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে *গুণময়ী* রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ "প্রকৃতির জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন" বলেছেন। প্রকৃতির জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্য বোঝাতে এই শ্লোকটিতে আভাসে বলা হয়েছে *উচ্চাবচানি* অর্থাৎ "উচ্চ এবং নীচ উভয়প্রকার প্রজন্ম"। কোনও বিশেষ প্রজন্মের মধ্যে যেমন রূপসৌন্দর্য, কদাকার শরীর, দেহবল, দুর্বলতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদি থাকে, তেমনই প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির অল্পবিস্তর বিকাশ অনুসারে, বিভিন্ন জীব-প্রজন্মের উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*—"সৎ এবং অসৎ প্রজন্মের মাঝে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে জীবের সঙ্গ-সান্নিধ্যের ফলেই এমন হয়ে থাকে।" ঠিক তেমনই আমরা এই বিবৃতিটিও পাই—

> *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।*
> *জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥*

"যাঁরা সত্ত্বগুণের ভাবে অবস্থিত, তাঁরা ক্রমেই স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হন; যারা রজোগুণ সম্পন্ন, তারা জড়জাগতিক গ্রহলোকে বাস করে; এবং যারা তমোগুণ সম্পন্ন, তারা নারকীয় জগতে অধঃপতিত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/১৮)

জড় জাগতিক জীবনধারার তিনটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—দেব, তির্যক এবং নর অর্থাৎ, দেবতাগণ, মনুষ্যেতর প্রাণীগণ, এবং মানবজাতি। বিভিন্ন প্রজাতির জীবনে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের বিবিধ প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকে। বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি ইন্দ্রিয়াদি, যথা যৌনাঙ্গ, নাসারন্ধ্র, জিহ্বা, কর্ণ এবং চক্ষুর দ্বারা বিভিন্ন প্রজাতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে। যেমন, পায়রাদের প্রায় অবাধে অপরিমিত যৌন সংযোগের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ভালুকেরা প্রচুর নিদ্রার সুযোগ পেয়েছে। বাঘ এবং সিংহেরা লড়াই আর মাংসাহারের ক্ষমতা দেখায়, ঘোড়ারা দ্রুত ধাবনের জন্য তাদের পায়ের বৈশিষ্ট্যে সুপরিচিত, শকুন আর চিলেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা রয়েছে, এবং আরও কত এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানবজাতি তার বিপুল পরিমাণ মস্তিষ্কের জন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়েছে, যার উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ্য।

এই শ্লোকটির মধ্যে *স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে* বাক্যাংশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। *স্ব* শব্দটি অধিকার বোঝায়। সকল জীব পরমেশ্বর ভগবানের আয়ত্তাধীন (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। সুতরাং এই শ্লোকটি অনুসারে জীবগণের দুটি স্বেচ্ছাধিকার রয়েছে—*মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে* এবং *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে*।

মাত্রা বলতে জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি বোঝায়, এবং *প্রসিদ্ধয়ে* বলতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ বোঝায়। সুতরাং *মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে* মানে "সার্থকভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগে নিয়োজিত থাকা।"

অপরপক্ষে *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে* বলতে বোঝায় কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন। দুই ধরনের আত্মা হয়—জীবাত্মা, অর্থাৎ সাধারণ জীবসত্তা, যা অধীনস্থ থাকে, এবং পরমাত্মা, যিনি পরম জীবসত্তা এবং তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র থাকেন। কিছু জীব দুই ধরনের আত্মার উপলব্ধিতে প্রয়াসী হয়, এবং এই শ্লোকটিতে *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ঐ সকল জীবকে ঐ ধরনের উপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যই পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সেই উপলব্ধির মাধ্যমে তারা ভগবদ্ধামে যেখানে জীবন অনন্ত এবং পূর্ণ সুখানন্দ আর সম্যক জ্ঞান বিরাজ করছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই ভাবধারা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৮৭/২) বেদস্তুতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ নানামসৃজৎ প্রভুঃ ।
মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥

"শ্রীভগবান বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং প্রাণবায়ু জীবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের জন্য, উচ্চলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানাদির জন্য এবং পরিণামে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের জন্য।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শ্রীভগবানের সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ উদ্দেশ্য মাত্র একটি—স্বয়ং ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রগতি প্রশস্ত করা। যদিও বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানই ইন্দ্রিয়সুখতৃপ্তি উপভোগের পথ প্রশস্ত করে রেখেছেন, তবে উপলব্ধি করা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরিণামে বদ্ধজীবগণের কোনও নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করেন না। শ্রীভগবান ইন্দ্রিয় উপভোগের সুবিধা (*মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে*) দিয়ে থাকেন যাতে জীবগণ ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীভগবানকে বাদ দিয়ে তৃপ্তি উপভোগের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক জীবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীভগবান এমন একটি বিধিবদ্ধ কার্য পদ্ধতি দিয়েছেন যাতে জীব ক্রমশ তাদের সব প্রবণতা নিঃশেষ করে তার নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের মর্যাদা বুঝতে পারে। শ্রীভগবান নিঃসন্দেহে সকল সৌন্দর্য, আনন্দ এবং তৃপ্তি সুখের পরম আধার, এবং তাই শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করে থাকা সকল জীবের কর্তব্য। যদিও সৃষ্টি তত্ত্বের দুটি আপাতগ্রাহ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও

বুঝতে হবে যে, চরম উদ্দেশ্য মাত্র একটি। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের আয়োজন শেষ পর্যন্ত জীবকে একমাত্র ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করতে হবে।

শ্লোক ৪

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে বর্ণিত; **সৃষ্টানি**—সৃষ্ট; **ভূতানি**—জীবগণ; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করার পরে; **পঞ্চধাতুভিঃ**—পঞ্চ মূল উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) সমন্বয়ে সৃষ্ট; **একধা**—একক (মনের অধিদ্রষ্টা); **দশধা**—দশবিধ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিদ্রষ্টা স্বরূপ); **আত্মানম্**—স্বয়ং; **বিভজন্**—বিভক্ত করে; **জুষতে**—তিনি নিযুক্ত করেন (তিনি জীবাত্মাকে নিয়োজিত করেন); **গুণান্**—পার্থিব গুণবৈশিষ্ট্যাদি সহকারে।

অনুবাদ

এইভাবে সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরগুলির মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তাতে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় করেন, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের জন্য জড়জাগতিক প্রকৃতি ত্রিবিধ গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি বদ্ধ জীবকে অগ্রসর হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

এক পরমাত্মা পঞ্চ ভৌত তথা পার্থিব উপাদানগুলির (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সক্রিয় পার্থিব মনকে প্রয়োগ করে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক কার্যকলাপকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক)-এর মধ্যে বিভক্ত করেন এবং আরও স্থূল প্রকৃতির পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হাত, পা, মুখ, যোনি এবং গুহ্যদ্বার) রূপে বিভক্ত করেন। যেহেতু মুক্তাত্মা জীবের মধ্যে শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনের সুতীব্র প্রবণতা থাকে, সেই কারণে তাঁরা পার্থিব ভাল এবং মন্দ দ্বৈতভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন না। জাগতিক অভিপ্রকাশের অতীত আপনার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস নিত্য উপভোগে রত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেম নিবেদনের মাধ্যমেই তাঁরা তৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

যখন বদ্ধজীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে তাদের প্রেমময় সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়, তখন তাদের মাঝে অবাঞ্ছিত বাসনা জাগে। সুতরাং, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রূপ, রস, গন্ধ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদির সেবা অনুশীলনে সমর্থ না হয়ে, এই সমস্ত জীবাত্মা ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের তিক্ত ফললাভে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি তাদের ভগবৎ-প্রেম কোনও ভাবে জাগরিত হয়, তা হলে বদ্ধ জীবগণ তাদের সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের দিব্য লীলার সেবায় নিপুণভাবে সংযোজন করতে পারবে।

বাস্তবিকই, সমস্ত পার্থিব ক্রিয়াকলাপই অতীব অবাঞ্ছিত। তবে বদ্ধজীব মায়ার প্রভাবে ভাল এবং মন্দ, সুখকর এবং বিরক্তিকর, তথা বিভিন্ন প্রকার পার্থক্যের আপাত বিভেদ প্রত্যক্ষ করতে থাকে। শ্রীভগবান তথা পরমাত্মা জীবের সম্মিলিত গোষ্ঠীগত এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যেকের অন্তস্তল উপলব্ধি করে থাকেন। তাই, কোনও নিষ্ঠাপরায়ণ জীবাত্মা যখন পারমার্থিক সিদ্ধি অর্জনে উন্মুখ হয়, তখন শ্রীভগবান তাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবার উপযোগী সামর্থ্য তার মধ্যে সৃষ্টি করেন। ভগবৎ-প্রেম দিব্য আনন্দ উপভোগের বিবিধ প্রকার রস-গন্ধে উচ্ছল হয়ে থাকে। অবশ্য, অজ্ঞতার বশে বদ্ধ জীব নিজেকেই সেবার যথার্থ লক্ষ্য বিবেচনা করে এবং তার ফলে সমগ্র বাস্তব পরিস্থিতির ভ্রান্ত সমীক্ষা করে থাকে।

শ্লোক ৫

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥ ৫ ॥

গুণৈঃ—গুণাদিসহ (ইন্দ্রিয়াদি); **গুণান্**—গুণাদি (ইন্দ্রিয়াদির লক্ষ্য বস্তু); **সঃ**—সে (জীব); **ভুঞ্জানঃ**—উপভোগ করে; **আত্ম**—পরমাত্মার সঙ্গে; **প্রদ্যোতিতৈঃ**—উজ্জীবিত হয়ে; **প্রভুঃ**—প্রভু; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **ইদম্**—এই; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট (দেহ); **আত্মানম্**—নিজের আত্মসত্তা বিবেচনা করে; **ইহ**—এইভাবে; **সজ্জতে**—সে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

অনুবাদ

পরমাত্মার দ্বারা উজ্জীবিত পার্থিব ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পার্থিব শরীরের প্রভু হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে সে জন্মরহিত নিত্য স্বরূপ ভ্রান্তি বোধ করে এবং শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

এমন হত যে, শ্রীভগবান তাঁর দিব্য গুণাবলীর (*গুণৈঃ*) মতো তাঁর কৃপার মাধ্যমে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দিব্য গুণাবলীর (*গুণান্*) আস্বাদন করতে সক্ষম হন। *আত্মপ্রদোতিতৈঃ* শব্দটির দ্বারা তা হলে বোঝায় যে, সর্বগুণের আধার পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তগণ সেইভাবেই দিব্যগুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়ে থাকেন। *মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানম্* শব্দগুলি বোঝায় যে, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ* শ্লোকে স্বয়ং ভগবান যেভাবে অভিব্যক্ত করেছেন, সেই অনুসারেই শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের শরীর পরিগ্রহ করার মাধ্যমে তাঁর নিজ দিব্য মর্যাদার সমকক্ষ হয়ে থাকেন। শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজধাম দ্বারকা নগরী অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রেমময় সনির্বন্ধ অনুরোধে হস্তিনাপুরে আরও কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেছিলেন। ঠিক তেমনই, বৃন্দাবনের বয়োজ্যেষ্ঠা গোপীগণ যখন তাঁদের হাতে তালি বাজিয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের তালে তাল দিয়ে পুতুলের মতো নৃত্য করেছিলেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/৪/৬৮) থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"শুদ্ধ ভক্ত নিত্য আমার অন্তস্থলে বিরাজ করেন, এবং আমি নিত্য শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করি। আমার ভক্ত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চেনেন না, এবং আমি তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *প্রভুঃ* শব্দটিও নিম্নলিখিত ভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। *প্র* শব্দটি বোঝায় *প্রকর্ষেণ*, অর্থাৎ "প্রবলভাবে", এবং *ভূ* বোঝায় *ভবতি*, অর্থাৎ "জন্মগ্রহণ করে"। সুতরাং *প্রভুঃ* বলতে *প্রকর্ষেণ দেবতির্যগাদিষু ভবতীতি সঃ*, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেবগণ, পশুপক্ষী, মানবজাতি এবং অন্যান্য নানা প্রকার জীবনধারায় জন্মগ্রহণ করা বোঝায়।

কোনও শুদ্ধ ভক্তের দিব্যভাবাপন্ন শরীরের প্রতি শ্রীভগবানের আসক্তি বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামীর বিবৃতি সমর্থন করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি (অন্ত্য ৪/১৯২-১৯৩) উদ্ধৃত করেছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

"দীক্ষা লাভের সময়ে যখন ভক্ত শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজেরই মতো শুদ্ধ সত্ত্বরূপে স্বীকার করে নেন।"

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

"এইভাবে যখনই ভক্তের শরীরটি দিব্য চিদানন্দময় স্বরূপ অর্জন করে, তখন ভক্ত সেই দিব্য দেহে শ্রীভগবানের চরণকমলে সেবা নিবেদন করতে থাকেন।"

শ্লোক ৬

কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্॥ ৬॥

কর্মাণি—বিবিধ প্রকার ফলাশ্রয়ী কর্ম; **কর্মভিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে; **কুর্বন্**—সম্পন্ন করার মাধ্যমে; **স-নিমিত্তানি**—যেগুলি প্রবল আকাঙ্ক্ষাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে; **দেহ-ভৃৎ**—পার্থিব দেহের মালিক; **তৎ তৎ**—বিবিধ; **কর্ম-ফলম্**—কর্মের ফল; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করার ফলে; **ভ্রমতি**—সে বিচরণ করে; **ইহ**—এই জগতের সর্বত্র; **সুখ**—সুখ-আহ্লাদ; **ইতরম্**—এবং অন্য অনেক কিছু।

অনুবাদ

উত্তরোত্তর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, শরীরধারী জীব নানা ধরনের ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে তার সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি নিয়োজিত করে। তখন সে সুখ এবং দুঃখ বলতে যা বোঝায়, তেমন অনুভূতি নিয়ে সারা জগতে বিচরণ করতে করতে তার পার্থিব ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

যুক্তি উত্থাপন করে বলা চলে যে, কোনও জীব যদি তার পূর্বকর্মের ফলভোগের অধীন হয়ে থাকে, তা হলে তার সহজ স্বাধীন ইচ্ছার তো কোনই অবকাশ থাকবে না; কেউ একবার পাপময় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকলে, সেই জীব পূর্বকর্মের জন্য চিরকাল ফলভোগের অধীন হয়ে থাকার ফলে, তাকে সীমাহীন দুঃখদুর্দশার ধারাবাহিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতেই হবে। এই ধরনের কল্পনাপ্রসূত যুক্ত্যাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিচার সম্পন্ন এবং পরমকল্যাণময় ভগবানের অস্তিত্ব

চিন্তা করা চলে না, যেহেতু জীব তার পূর্বকর্মাদির ফলস্বরূপ পাপময় ক্রিয়াকর্মাদি সাধনে বাধ্য হয়ে থাকে, যে কাজগুলিও তার আরও পূর্বকর্মাদির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাধিত হতে থাকে। যেহেতু কোনও সাধারণ ভদ্রলোকও নির্দোষ মানুষকে অযথা শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন না, তা হলে এই জগতের মাঝে বদ্ধ জীবদের অসহায় দুঃখভোগের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে থাকার মতো ভগবানই বা কেমন করে থাকতে পারেন?

নির্বুদ্ধিপ্রসূত এই যুক্তির জবাবে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত সহজেই দিতে পারা যায়। যদি আমি কোনও বিমানযাত্রার জন্য টিকিট কিনে, বিমানে উঠি, এবং আকাশ ভ্রমণ শুরু করি, তা হলে একবার যখন আমি বিমানটিতে ওঠবার মনস্থ করে ফেলেছি, তখন বিমানটি উড়তে শুরু করে দেওয়ার পরে বিমানটি আমাকে নামতে দেওয়ার আগে পর্যন্ত সমানে উড়িয়ে নিয়ে যেতেই বাধ্য করে রাখে। তবে এই সিদ্ধান্তটির ফললাভে আমি বাধ্য হয়েই থাকি, বিমানের মধ্যে থাকাকালীন আমি অন্যান্য নানা প্রকার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমি বিমান পরিচারিকার কাছ থেকে খাবারদাবার নিয়ে খেতে পারি কিংবা না নিতেও পারি, আমি পত্রপত্রিকা পড়তে পারি, আমি ঘুমাতে পারি, বিমানের মধ্যে সরু চলাপথে সামনে পিছনে যাতায়াত করতেও পারি, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি, এবং আরও কিছু করা চলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে—কোনও একটি বিশেষ শহরের দিকে আমি উড়ে চলতে থাকলেও—সেই কাজটি আমার পক্ষে বিমানে উঠার পূর্বসিদ্ধান্তের কর্মফল হওয়া সত্ত্বেও—তেমন পরিবেশেও আমি সকল সময়ে নিত্যনতুন সিদ্ধান্ত করে চলেছি এবং নতুন কর্মফলও সৃষ্টি করতে থাকছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমি বিমানের মধ্যে কোনও বিপত্তি সৃষ্টি করি, তাহলে বিমান নামলেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তা না করে, আমি যদি বিমানে আমার পাশে বসে থাকা এক ব্যবসায়ী মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি, তা হলে সেই সংযোগ-সম্পর্কের ফলে ভবিষ্যতে কোনও ব্যবসায়িক শুভলাভ ঘটে যেতে পারে।

এইভাবেই, জীব যদিও কর্মফলের নিয়ম অনুসারে বিশেষ কোনও শরীর ধারণে বাধ্য হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও মানব শরীরের মধ্যে সর্বদাই স্বাধীন ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকে। সুতরাং মানব-জীবনে জীব তার পূর্বকর্মের ফলভোগে বাধ্য হয়ে থাকলেও, তার বর্তমান জীবনের ক্রিয়াকর্মের জন্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দায়ী করা অযৌক্তিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, মায়ার প্রভাব এমনই তীব্র যে, নরকতুল্য পরিবেশেও গর্বোদ্ধত বদ্ধ জীব মনে করে যে, সুখের জীবন সে উপভোগ করছে।

শ্লোক ৭

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্ ।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৭ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **কর্ম-গতিঃ**—বিগত জীবনের কর্মফলের মাধ্যমে নির্ধারিত জীবনের গতি; **গচ্ছন্**—লাভ করে; **বহু-অভদ্র**—নানাভাবে অশুভ; **বহাঃ**—যা বহন করতে থাকে; **পুমান্**—জীব; **আভূত-সংপ্লবাৎ**—সৃষ্টিময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় পর্যন্ত; **সর্গ-প্রলয়ৌ**—জন্ম ও মৃত্যুর; **অশ্নুতে**—সে ভোগ করতে থাকে; **অবশঃ**—অসহায় ভাবে।

অনুবাদ

এইভাবেই বদ্ধ জীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে—সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিশ্ব প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, পার্থিব জগতের মাঝে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পুনঃ পুনঃ দুঃখকষ্ট ভোগের এই তত্ত্ব শোনবার পরেও যদি কেউ তেমন অসহায় জীবকে শ্রীভগবানের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতে থাকে, তা হলে সে অবধারিতভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এমনই এক ঘোর অন্ধকারময় প্রদেশে নিমজ্জিত হবে, যেখান থেকে উদ্ধার লাভ কঠিন হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৮

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্ ।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥

ধাতু—পার্থিব উপাদানগুলির; **উপপ্লব**—বিনাশ; **আসন্নে**—যখন আসন্ন হয়; **ব্যক্তম্**—অভিব্যক্ত সৃষ্টি; **দ্রব্য**—স্থূল দ্রব্যাদি; **গুণ**—এবং সূক্ষ্ম গুণাবলী; **আত্মকম্**—সম্বলিত; **অনাদি**—আদিহীন; **নিধনঃ**—অন্তহীন; **কালঃ**—সময়; **হি**—অবশ্যই; **অব্যক্তায়**—অব্যক্ত রূপের মাঝে; **অপকর্ষতি**—সমাকৃষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

পার্থিব উপাদানগুলির বিনাশ সমাসন্ন হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অনাদি অনন্ত মহাকালের গর্ভে সর্বপ্রকার অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদিসহ আকৃষ্ট করে থাকেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান শ্রীকপিলদেব উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পার্থিব জড়া প্রকৃতি সৃষ্টির আদিপর্বে '*প্রধান*' নামে অভিহিত এক অনড় সমাবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। যখন শ্রীবিষ্ণু তাঁর 'কাল'-রূপী সৃষ্টিধর্মীদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন পার্থিব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়, যার পরিণামে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির অভিপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সময় শেষ হয়ে গেলে, সেই 'কাল' যা থেকে সর্বপ্রথমে সৃষ্টির মাঝে নারী প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছিল, তা আবার জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি পর্বে আত্মসম্বরণ করে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, 'কাল'-রূপী সৃষ্টিধর্মী মহাশক্তি তখন প্রত্যাহৃত হয়, এবং তা পার্থিব প্রকৃতির মূল কারণরূপে আবির্ভূত স্বয়ং পরমাত্মার মাঝে বিলীন হয়ে যায় (*অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*)।

এই ধরনের সৃষ্টি এবং প্রলয়, জন্ম এবং মৃত্যুর প্রযুক্তিমূলক তত্ত্বের আভাস শ্রীভগবানের অনন্ত দিব্যধামে বিরাজ করে না। চিন্ময় ব্রহ্মাকাশে শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যময় সুখাস্বাদন কখনই পার্থিব জড়জগতের মাঝে অভিপ্রকাশিত জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংসের নিকৃষ্ট চক্রের আবর্তে বিড়ম্বিত হয় না।

শ্লোক ৯

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

শতবর্ষ—একশত বর্ষব্যাপী; **হি**—অবশ্য; **অনাবৃষ্টিঃ**—অনাবৃষ্টি; **ভবিষ্যতি**—হবে; **উল্বণা**—ভয়াবহ; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তৎকাল**—সেই সময়ে; **উপচিত**—সৃষ্টি হয়; **উষ্ণ**—তাপ; **অর্কঃ**—সূর্য; **লোকান্**—গ্রহলোকাদি; **ত্রীন্**—তিন; **প্রতপিষ্যতি**—ভীষণভাবে দগ্ধ হবে।

অনুবাদ

যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীতে একশতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির প্রকোপ হয়। একশত বর্ষ সূর্যের তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তার অগ্নিময় তাপে ত্রিভুবন দগ্ধ হতে শুরু করে।

শ্লোক ১০

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ।
দহন্নূর্ধ্বশিখো বিষ্বক্ বর্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥

পাতালতলম্—পাতাল গ্রহে; **আরভ্য**—শুরু করে; **সঙ্কর্ষণ-মুখ**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীসঙ্কর্ষণরূপী মুখ থেকে; **অনলঃ**—অগ্নি; **দহন্**—জ্বলতে থাকে; **ঊর্ধ্বশিখঃ**—তার ঊর্ধ্বগামী শিখা সহ; **বিষ্বক্**—সর্বদিকে; **বর্ধতে**—বৃদ্ধি পেতে থাকে; **বায়ুনা**—বাতাসে; **ঈরিতঃ**—তাড়িত হয়ে।

অনুবাদ

পাতাল লোক থেকে শুরু করে, সেই আগুন ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে উদ্গীরণ হতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী সেই অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বায়ুতাড়িত হয়ে সর্বদিকে দগ্ধ প্রবাহ বিস্তার করতে থাকে।

শ্লোক ১১

সংবর্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্ ॥ ১১ ॥

সংবর্তকঃ—প্রলয়ের; **মেঘগণঃ**—মেঘপুঞ্জ; **বর্ষতি**—বর্ষণ করবে; **স্ম**—অবশ্যই; **শতং সমাঃ**—একশত বর্ষব্যাপী; **ধারাভিঃ**—প্রবল ধারায়; **হস্তিহস্তাভিঃ**—(হস্তিশুণ্ডের মতো দীর্ঘ) বৃষ্টিবিন্দুর দ্বারা; **লীয়তে**—বিলীন হবে; **সলিলে**—জলে; **বিরাট্**—মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

সংবর্তক নামে প্রলয়ঙ্কর মেঘরাশি একশত বর্ষব্যাপী বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করতে থাকে। হাতির শুঁড়ের মতো সুদীর্ঘ এক-একটি বৃষ্টিবিন্দুর ভয়াবহ প্রবল ধারায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়ে যায়।

শ্লোক ১২

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তখন; **বিরাজম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **উৎসৃজ্য**—(তাঁর শরীর) উৎসর্গ করে; **বৈরাজঃ পুরুষঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপী পরমেশ্বর (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা); **নৃপ**—হে নিমিরাজ; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত প্রকৃতি (প্রধান); **বিশতে**—তিনি অনুপ্রবেশ করেন; **সূক্ষ্মম্**—অতি সূক্ষ্ম; **নিরিন্ধনঃ**—ইন্ধন শূন্য; **ইব**—মতো; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

হে নিমিরাজ, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপের অন্তরাত্মা শ্রীবৈরাজ ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীর ত্যাগ করেন, এবং আগুনের ইন্ধন নিঃশেষিত হওয়ার ফলে যেমন হয়, সেইভাবেই তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত 'প্রধান' প্রকৃতির মাঝে অনুপ্রবেশ করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকের মধ্যে *বৈরাজঃ* শব্দটি বোঝায় যে, বিভিন্ন বদ্ধ জীবের সমগ্র সত্তা ব্রহ্মার মধ্যে থেকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রলয়কালে তাঁরই মাঝে একাত্ম হয়ে যায়। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের অভিপ্রকাশের দ্বারা জড়জাগতিক সৃষ্টির মধ্যে অস্থায়ী তথা অনিত্য কিছু রূপ, গুণ এবং ক্রিয়াকলাপের লীলা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকল সৃষ্টি প্রত্যাহার করে নেন, তখন সমগ্র দৃশ্যমান চরাচর অরূপ সত্তা ফিরে পায়। সুতরাং শ্রীভগবানের বিশ্বরূপটিকে ভগবানের নিত্যরূপ বলে স্বীকার করতে পারা যায় না। এই রূপটি নিতান্তই মায়ার রাজ্যের মধ্যে তাঁর নিজ রূপের অস্থায়ী অনিত্য কাল্পনিক সাদৃশ্য মাত্র। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে, এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেও, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপটিকে শ্রীভগবানের চিন্তায় ধ্যানস্থ হওয়ার অনুকূলে কনিষ্ঠ ভক্তদের উদ্দেশ্যে একটি কল্পনাশ্রিত রূপ বলে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বিশেষভাবে জড়বাদী, তারা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান বাস্তবিকই জড়জাগতিক শক্তি প্রদর্শনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অর্থাৎ চিরন্তন সত্যস্বরূপ আনন্দ ও জ্ঞানের আধার। সেই কারণে ঐ ধরনের স্থূলবুদ্ধি জড়বাদী মানুষদের ভগবদ্-বিশ্বাসী করে তোলার উদ্দেশ্যেই, পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীররূপে বস্তুনির্ভর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্যানচর্চায় বৈদিক শাস্ত্রাদি তাদের উৎসাহ দিয়েছে। এই ধরনের সামগ্রিক ভগবৎ বিশ্বাসী ধ্যানধারণার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের চরম সত্তা অভিব্যক্ত হয় না, তবে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রমশ মন আকৃষ্ট করে তোলার একটি পদ্ধতি মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে প্রলয়কালে শ্রীব্রহ্মাকে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের প্রামাণিকতা ব্যক্ত হয়েছে—

ব্রহ্মণাসহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"চরম প্রলয়কালে সমস্ত কৃতবিদ্য জীবাত্মা শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে একই সাথে পরমধামে প্রবেশ করেন।" যেহেতু শ্রীব্রহ্মাকে কখনও-বা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিবেচনা করা হয় বলে, অবশ্যই তিনি শুধুমাত্র 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত জড়জাগতিক প্রকৃতির অপরিদৃশ্যমান অবস্থার মাঝে প্রবেশ করেন, তাই নয়—তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভও করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এক ধরনের অভক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞাদি এবং অন্যান্য ধরনের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রহ্মার ধামে গমন করে থাকে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রহ্মা স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে বিবেচিত না হতেও পারেন। তাই *অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, ব্রহ্মার মতো অভক্ত পুরুষ জড়জাগতিক কলাকৌশলের নৈপুণ্য সম্পর্কিত পরম বিশ্বব্যাপী মর্যাদা অর্জন করে থাকলেও, তিনি চিদাকাশে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু যখন ব্রহ্মা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের একজন ভক্ত, তখন *অব্যক্তম্* শব্দটি চিদাকাশ বোঝায়; যেহেতু চিদাকাশ কখনই বদ্ধ জীবদের কাছে প্রতিভাত হয় না, তাই সেটিকেও *অব্যক্ত* বিবেচনা করা চলে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন না করার ফলে যদি ব্রহ্মাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে না পারেন, তা হলে অন্যান্য যে সব মানুষ ধর্মপ্রাণ অথবা অভিজ্ঞ অভক্ত বলে পরিচিত, তাদের কথা আর কী বলার আছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্মার পদমর্যাদার মধ্যে তিন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস আছে, যেমন—কর্মী, জ্ঞানী এবং ভক্ত। যে ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম কর্মী, তাঁকে পার্থিব জগতে ফিরে আসতে হবে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সর্বোত্তম মনোধর্মী দার্শনিক হয়ে ওঠেন, তিনি নির্বিশেষ শূন্যবাদী মুক্তি লাভ করতে পারেন; এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান্ ভক্ত হয়ে ওঠার ফলে যিনি ব্রহ্মার পদমর্যাদা অর্জন করেন, তিনি শ্রীভগবানের নিজধামে প্রবেশ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩২/১৫) আরও একটি বিষয় বিবৃত হয়েছে—কোনও ব্রহ্মা ভগবদ্ভক্ত কিন্তু নিজেকে শ্রীভগবানের সমকক্ষ কিংবা স্বতন্ত্র স্বাধীন মনে করবার প্রবণতা লাভ করেছেন, তিনি প্রলয়কালে মহাবিষ্ণুর ধাম লাভ করেন, কিন্তু যখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাঁকে ফিরে এসে আবার ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে *ভেদদৃষ্ট্যা* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন শক্তিমান রূপে চিন্তার প্রবণতা বোঝায়। শ্রীব্রহ্মার মতো একজন মহান জীবের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের গতিলাভের সম্ভাবনা থেকে সুনিশ্চিতভাবেই

প্রমাণিত হয় যে, সচ্চিদানন্দময় অনন্ত জীবন লাভের জন্য কোনও প্রকার পার্থিব মর্যাদাই অর্থহীন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুনিশ্চিতভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, সকল প্রকার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা যদি কেউ বর্জন করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে শ্রীভগবান স্বয়ং তাকে রক্ষা করে থাকেন এবং চিদাকাশে পরমধামে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অর্জনের চেষ্টা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করা নিতান্তই ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই ধরনের অন্ধ প্রচেষ্টাকে *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে *বহুলায়াসম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ এই যে, এই ধরনের কাজকর্ম জাগতিক রজোগুণাশ্রিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রভু, এবং তাঁর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যবস্থা অবশ্যই *বহুলায়াসম্* অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টার ফল, তা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে ঐ ধরনের সমস্ত রজোগুণাশ্রিত কাজই, তা শ্রীব্রহ্মার দ্বারা সম্পন্ন হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ ব্যতিরেকে পরিণামে নিরর্থক প্রমাণিত হয়।

শ্লোক ১৩

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে ।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ুনা—বায়ুর দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **গন্ধা**—সুগন্ধ গুণ; **ভূঃ**—ক্ষিতি; **সলিলত্বায় কল্পতে**—জলে পরিণত হয়; **সলিলম্**—জল; **তৎ**—তার দ্বারা (ঐ বায়ু দ্বারা); **হৃতরসম্**—রসাস্বাদন অপহরণ করে; **জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে**—অগ্নিতে পরিণত হয়।

অনুবাদ

বায়ুর দ্বারা ক্ষিতির সুগন্ধি গুণ অপহৃত হলে, তা জলে পরিণত হয়; এবং সেই বায়ুর দ্বারা জলের রসাস্বাদন অপহৃত হলে, তা অগ্নিতে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে জড়জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিবিধ বিবরণ দেওয়া আছে, যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মহাশূন্য তথা বোম্ থেকে বায়ুর সৃষ্টি হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, এবং জল থেকে মাটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন, বিপরীত ক্রমানুসারে, সৃষ্টি বিলীন হতে থাকে। সেই অনুযায়ী পৃথিবীর মাটি যে-জল থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, সেই জলের অবস্থায় ফিরে যায় এবং জল তেমনই আগুনে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৪

হৃতরূপং তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

হৃত-রূপম্—রূপের গুণ অপহৃত হওয়াতে; **তু**—অবশ্যই; **তমসা**—অন্ধকারে; **বায়ৌ**—বায়ুর মধ্যে; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়ে যায়; **হৃতস্পর্শঃ**—স্পর্শ না পেয়ে; **অবকাশেন**—মহাশূন্য তথা ব্যোমের সাহায্যে; **বায়ুঃ**—বাতাস; **নভসি**—মহাশূন্যে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **কাল-আত্মনা**—মহাকালরূপে পরমাত্মা; **হৃতগুণম্**—যথার্থ গুণ অপহৃত হলে; **নভঃ**—মহাকাশ; **আত্মনি**—অজ্ঞানতা স্বরূপ মিথ্যা অহমিকার মাঝে; **লীয়তে**—বিলীন হয়।

অনুবাদ

অন্ধকারের দ্বারা অগ্নির স্বরূপ অপহৃত হলে তা বায়ুতে পরিণত হয়। মহাশূন্যের প্রভাবে বায়ু যখন তার স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলে, তখন তা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যখন মহাশূন্যের যথার্থ গুণাবলী পরমাত্মা অপহরণ করে নেন, তখন মহাকালের প্রভাবে সেই মহাশূন্য তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৫

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **সহ বৈকারিকৈঃ**—সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহঙ্কার থেকে প্রসূত দেবতাগণ সহ; **নৃপ**—হে রাজা; **প্রবিশন্তি**—তারা প্রবেশ করে; **হি**—অবশ্যই; **অহঙ্কারম্**—অহঙ্কার (অহম্) প্রবৃত্তি; **স্বগুণৈঃ**—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণাদি সহ; **অহম্**—অহঙ্কার; **আত্মনি**—মহৎ-তত্ত্বের মাঝে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, তমোগুণের প্রভাবে উৎপন্ন মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে সকল প্রকার পার্থিব অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়; এবং দেবতাদের সঙ্গে মনও সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে সমগ্র মিথ্যা অহম্ বোধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাদি সমেত মহৎ-তত্ত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়।

শ্লোক ১৬

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

এষা—এই; **মায়া**—জড়া শক্তি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সর্গ**—সৃষ্টির; **স্থিতি**—প্রতিপালন; **অন্ত**—প্রলয় (ব্রহ্মাণ্ডের); **কারিণী**—কারণ সৃষ্টিকারী; **ত্রি-বর্ণা**—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাবলী সহ; **বর্ণিতা**—বর্ণিত হয়েছে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **কিম্**—কি; **ভূয়ঃ**—আরও; **শ্রোতুম্**—শ্রবণে; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ

এখন আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বর্ণনা করছি। জড়া প্রকৃতির তিন প্রকার গুণ সমন্বিত মায়ার এই প্রবল প্রতাপ শ্রীভগবানের দ্বারাই তাঁর জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় লীলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তেজোসম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখন, আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি সম্পর্কে নিমিরাজ তাঁর আতঙ্কের মনোভাব শ্রীনবযোগেন্দ্র-বর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং যাতে মায়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন, সেজন্য মায়ার বিশদ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেছিলেন। এখন, শ্রীঅন্তরীক্ষ (অন্যতম নবযোগেন্দ্র মুনি) মায়াশক্তি বর্ণনা করবার পরে, পরামর্শ দিচ্ছেন যাতে মায়ার কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে নিমিরাজ অনুসন্ধিৎসু হন। রাজার কাছ থেকে সেই ধরনের কোনও প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করেই, শ্রীঅন্তরীক্ষ মুনি নিজেই পরামর্শ দিচ্ছেন, "যেহেতু আপনি এখন মায়ার প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার উৎসাহী হওয়া উচিত।" শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, সেটাই শ্রীঅন্তরীক্ষ মুনির *কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি,* "আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?" প্রশ্নটির তাৎপর্য।

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত প্রলয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যার সারমর্ম নিচে দেওয়া হল। চেতন সত্তায় অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেব, যিনি মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকটিত হয়ে আছেন। মহত্তত্ত্বের আরও পরিবর্তন হলে মিথ্যা অহমিকার তিনটি রূপ এইভাবে প্রকটিত হয়—(১) বৈকারিক থেকে সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অহমিকা

একাদশ ইন্দ্রিয় মন রূপে প্রতিভাত হয়, যার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অনিরুদ্ধ। (২) তৈজস থেকে রজোগুণের মাধ্যমে বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীপ্রদ্যুম্ন, এবং তা থেকে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সেগুলির বিভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সহ প্রতিভাত হয়। (৩) তমোগুণের মিথ্যা অহমিকা থেকে শব্দের সূক্ষ্ম রূপ সৃষ্টি হয়, এবং ঐ শব্দ থেকে ক্রমশ বায়ু ব্যোম থেকে শুরু করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের রূপ প্রকটিত হতে থাকে। মিথ্যা অহমিকা এই তিনটি প্রকরণের আরাধ্য দেবতা শ্রীসংকর্ষণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের অধ্যায় ২৬ এর, ২১, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২ এবং ৩৫ সংখ্যক শ্লোকগুলি থেকে এই বর্ণনা গৃহীত হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জড় জগতের জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। তিনি রক্তিম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণ মণ্ডিত। তাঁর রক্তিম প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য থেকে জড়া প্রকৃতির উদ্ভব হয়, শ্বেত বর্ণের বৈশিষ্ট্যের মাঝে তার স্থিতি লাভ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। এই মায়া থেকে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এবং মহত্তত্ত্ব থেকে উপরে উল্লিখিত মিথ্যা অহমিকার তিনটি বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। প্রলয়কালে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম নামে পাঁচটি বিপুল উপাদান তমোগুণের মিথ্যা অহমিকার মাঝে বিলীন হয়ে যায়—যা থেকে তাদের প্রথমে উৎপত্তি হয়েছিল; দশটি ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি রজোগুণের মিথ্যা অহঙ্কারের মাঝে বিলীন হয়ে যায়; এবং অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ সহ মন সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহঙ্কারের মাঝে বিলীন হয়ে যায়, যা তারপরে মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়, যা আবার প্রকৃতি অর্থাৎ অপ্রকাশিত অপ্রকটিত প্রধান প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে।

উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে, প্রত্যেকটি স্থূল উপাদানের গুণবৈশিষ্ট্যাদি অপসৃত হলে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়; উপাদানটি তখন পূর্ববর্তী উপাদানের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে এই বিষয়টি বুঝতে পারা যেতে পারে। মহাশূন্যে অর্থাৎ মহাকাশে শব্দের গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে। বায়ুর মধ্যে শব্দ এবং স্পর্শের গুণবৈশিষ্ট্যাদি রয়েছে। অগ্নির মাঝে শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে। জলের মাঝে শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং স্বাদ রয়েছে। আর মাটিতে রয়েছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, স্বাদ এবং গন্ধ। অতএব মহাব্যোম থেকে শুরু করে ক্ষিতি অর্থাৎ মাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি উপাদানই নিজ নিজ *গুণবিশেষম্* সংযোগে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। যখন সেই গুণবৈশিষ্ট্য অপসৃত হয়, তখন কোনও উপাদান তার পূর্ববর্তী উপাদান থেকে অভিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলে তারই মাঝে লীন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন প্রবল বায়ু মাটি

থেকে গন্ধ নিয়ে চলে যায়, তখন মাটিতে কেবলমাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং স্বাদ বর্তমান থাকে, এবং তার ফলে তা জল থেকে অভিন্ন হয়ে যায়, কারণ জলের মধ্যেই তা বিলীন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন প্রবল বায়ু মাটি থেকে গন্ধ দূর করে নিয়ে যায়, তখন মাটিতে শুধুমাত্র শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ বিদ্যমান থাকে, যার ফলে তা অগ্নি থেকে অভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনই, যখন জল তার রস, অর্থাৎ আস্বাদ হারিয়ে ফেলে, তখন তাতে শুধুমাত্র শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ থাকে, যার ফলে তা অগ্নি থেকে অভিন্ন হয়ে যায়, যাতে ঐ তিনটি গুণই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বায়ু গন্ধ নিয়ে যায় যাতে মাটি জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং আস্বাদন ফিরিয়ে নেয়, যাতে জল আগুনের সাথে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকার অগ্নি থেকে রূপ সরিয়ে নেয়, তখন অগ্নি বায়ুতে বিলীন হয়ে যায়। মহাব্যোম তেমন বায়ু থেকে স্পর্শ চেতনা সরিয়ে নেয়, এবং বায়ু মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান মহাকাল রূপে মহাশূন্য থেকে শব্দ লোপ করেন, এবং মহাশূন্য তখন যে তমোগুণের প্রকৃতির মাঝে অহমিকা থেকে উদ্ভব হয়েছিল, তারই মাঝে বিলীন হয়ে যায়। অবশেষে, অহমিকা মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়, যা আবার অব্যক্ত প্রধান তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়, এবং এইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সাধিত হয়।

শ্লোক ১৭

শ্রীরাজোবাচ

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—নিমিরাজ বললেন; **যথা**—কিভাবে; **এতাম্**—এই; **ঐশ্বরীম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়াম্**—জড়জাগতিক শক্তি; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা আত্মনিয়ন্ত্রিত নয়; **তরন্তি**—তারা অতিক্রম করতে পারে; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **স্থূল-ধিয়ঃ**—জড়জাগতিক আসক্তির ফলে যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে; **মহর্ষে**—হে মহর্ষি; **ইদম্**—এই; **উচ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে বলুন।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—হে মহর্ষি, যারা আত্মসংযমী নয়, তাদের পক্ষে সর্বদাই অনতিক্রম্য পরমেশ্বর ভগবানের যে মায়াশক্তি, তা কিভাবে কোনও নির্বোধ জড়বাদী মানুষও অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে, কৃপা করে তা বলুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, *স্থূলধিয়ঃ* শব্দটির দ্বারা এমন মানুষদের বোঝায়, যারা তাদের স্থূল জড়জাগতিক দেহটিকে নির্বোধের মতো আত্মপরিচয় প্রদান করে এবং তার ফলে কিভাবে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মে আত্মা মায়ার মাধ্যমে দেহান্তরিত হয়, তা বিশ্লেষণ করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *স্থূলধিয়ঃ* বলতে ধর্মপ্রাণ মানুষ রূপে অভিহিত কিছু লোককেও বোঝায়, যারা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আত্মোৎসর্গ করে ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়াস না করে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নিমিরাজ পূর্বেই একজন অগ্রণী ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি জানতেন যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এবং শুদ্ধ ভক্তিসেবা নিবেদনের সাহায্যে তাঁকে তুষ্ট করে মায়ার শক্তিকে অতিক্রম করা যায়। তাই যারা বৃথাই নিজেদের অতিশয় জ্ঞানী বলে মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম তাদের ক্রমান্বয়ে মায়াবদ্ধ করে তুলছে, সেই কাজে আসক্ত হয়ে রয়েছে, তাদের কল্যাণের জন্য রাজা এই প্রশ্নটি করছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'অমরকোষ' অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, *অকৃতাত্মভিঃ* শব্দটির মাধ্যমে *অপূর্ণত্বম্*, অর্থাৎ যাদের জীবন অপূর্ণ, তাদেরই বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যেক জীবের সঙ্গেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের সম্বন্ধ রয়েছে। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিত্যকালের প্রভু, আপনার অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ, আপনার স্নেহময় সন্তান কিংবা আপনার মাধুর্যময় দাম্পত্য আকর্ষণের বিষয় রূপে মনে করতে পারে। অবশ্যই, ঐ ধরনের ভাবোন্মাদনার সাথে সাধারণ জাগতিক যে সমস্ত ভাবাবেগ, যা চিন্ময় রসের বিকৃত প্রতিফলন রূপে দেখা যায়, তাতে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। জাগতিক পরিবেশে আমরা ঐ একই ধরনের দাস্য, সখ্য, পিতৃমাতৃপ্রেম, এবং দাম্পত্যপ্রেমের সম্বন্ধ আস্বাদনের প্রয়াসী হয়ে থাকি, তবে ঐ ধরনের অনুভূতি সর্বদাই অস্থায়ী জাগতিক দেহকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা মাত্র, যা প্রকৃতির নিয়মাধীনে অচিরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই সব প্রেমময় অনুভূতি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকল রূপসৌন্দর্য এবং অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস, তাঁর অভিমুখেই পরিচালিত করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভালবাসা অর্পণ করতে যে মানুষ জানে না, তার প্রেম অপূর্ণ, অর্থাৎ তার জীবন শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যার জীবন এইভাবে অপূর্ণ, তাকে *মন্দধীঃ* বলা যায়; অর্থাৎ উদার অভিজ্ঞতার অভাবে তার বুদ্ধি বিকল হয়েছে। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিমিরাজ এমনই কৃপাময় ছিলেন যে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "ঐ সব মন্দমতি মানুষেরা পারমার্থিক বিষয়াদি চর্চায় অতিশয় অলস বলেই, কিভাবে সহজ উপায়ে তারা মায়া অতিক্রম করতে পারে।"

শ্লোক ১৮

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধঃ উবাচ—শ্রীপ্রবুদ্ধ মুনি বললেন; **কর্মাণি**—ফলাশ্রয়ী কাজকর্ম; **আরভমাণানাম্**—প্রচেষ্টা করার ফলে; **দুঃখ-হত্যৈ**—দুঃখ হরণের জন্য; **সুখায় চ**—এবং সুখ আহরণের উদ্দেশ্যে; **পশ্যেৎ**—মানুষের দেখা উচিত; **পাক**—ফলাফলের বিষয়; **বিপর্যাসম্**—বিপরীত ফলশ্রুতি; **মিথুনী-চারিণাম্**—যারা নর এবং নারীরূপে সম্বন্ধ থাকে; **নৃণাম্**—সেই ধরনের মানুষদের।

অনুবাদ

শ্রীপ্রবুদ্ধ বললেন—মানুষের সমাজে নারী ও পুরুষদের ভূমিকা অনুসারেই বদ্ধ জীবগণ মিথুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তারা অনবরতই জাগতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করতে চায় এবং তাদের সুখ অফুরন্ত করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, অনিবার্যভাবেই তারা ঠিক বিপরীত ফলই লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অনিবার্য কারণেই তাদের সুখ অন্তর্হিত হয়, এবং তারা যতই বড় হতে থাকে, ততই তাদের জাগতিক অস্বস্তি বেড়ে চলে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তের কৃপা ছাড়া, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে নিজেকে মুক্ত করা নিদারুণ কঠিন কাজ, কারণ মৈথুন সুখ ভোগের আকর্ষণের ফলেই ঐ ধরনের মায়াময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শ্লোক ১৯

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা ।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ ১৯ ॥

নিত্য—নিয়ত; **অর্তিদেন**—বেদনাদায়ক; **বিত্তেন**—বিত্ত সম্পদ নিয়ে; **দুর্লভেন**—কঠোর পরিশ্রমলব্ধ; **আত্ম-মৃত্যুনা**—আত্ম-বিনাশ; **গৃহ**—নিজের গৃহ; **অপত্য**—সন্তানাদি; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন; **পশুভিঃ**—এবং গৃহপালিত পশুরা; **কা**—কি; **প্রীতিঃ**—সুখশান্তি; **সাধিতৈঃ**—(ধনসম্পদের সাহায্যে) যা লাভ করা যায়; **চলৈঃ**—চঞ্চল।

অনুবাদ

ধনসম্পদ নিত্য দুঃখের কারণ, সেই সম্পদ আহরণ করা খুব কঠিন, এবং তা আত্মবিনাশ ঘটায়। মানুষ তার ধনসম্পদ থেকে কী সুখ যথার্থভাবে পায়? তেমনই, মানুষ তার কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন এবং গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতিপালন করে, তা থেকে কেমন করে চরম তথা চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করতে পারে?

শ্লোক ২০

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্ ।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; **লোকম্**—ভূলোক; **পরম্**—পরজন্মে; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **নশ্বরম্**—অস্থায়ী; **কর্মনির্মিতম্**—ফলাশ্রয়ী কর্ম থেকে সৃষ্টি; **সতুল্য**—সমতুল্য জনের বিদ্বেষভাব থেকে; **অতিশয়**—এবং বয়স্কদের; **ধ্বংসম্**—এবং ধ্বংসের মাধ্যমে; **যথা**—যেমন; **মণ্ডলবর্তিনাম্**—ক্ষুদ্র শাসকবর্গের বিরোধিতায়।

অনুবাদ

যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদির ফলে পরজন্মে কেউ যদি স্বর্গলাভও করে, তবুও সেখানে চিরন্তন সুখশান্তি সে পেতে পারে না। এমনকি স্বর্গলোকেও যে সকল জীব বাস করে, তারাও জাগতিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের মাঝে এবং বরিষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষার পরিণামে বিচলিত বোধ করে। আর যেহেতু তাদের পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে, তখন স্বর্গবাসের সুযোগ হ্রাস পায় এবং তার ফলে স্বর্গবাসীরা তাদের স্বর্গীয় জীবন ধারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রশংসিত রাজাদের মতোই তারা নিত্য শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের কাছে নিগৃহীত হয় এবং তার ফলে তারা কখনই শান্তি পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ছান্দোগ্য উপনিষদ* (৮/১/৬) থেকে নিম্নরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—*তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।* "মানুষের বর্তমান জাগতিক সুখের পরিস্থিতি, তার পূর্বকর্মের ফল,

সময়ান্তরে বিলীন হয়ে যাবে। তেমনই, মানুষ তার পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ যদিও পরজন্মে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারে, তা হলেও তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবনতি ঘটবে।" যে যেমন বিশেষ শরীর ধারণ করে থাকে, তার জাগতিক ভোগ উপভোগের ভিত্তিও সেইভাবে গড়ে উঠে। জাগতিক শরীরটি হয় *কর্মচিতঃ*, জীবের জাগতিক পূর্বকর্মের সঞ্চিত ফলরাশি। যদি কেউ রূপসৌন্দর্য, শিক্ষাদীক্ষা, জনপ্রিয়তা, দেহবল এবং আরও নানাবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ শরীর লাভ করে থাকে, তা হলে অবশ্যই তার পক্ষে জাগতিক ভোগ-উপভোগের মাত্রাও হবে উচ্চস্তরের মানসম্পন্ন। অন্যদিকে, যদি কেউ কুৎসিৎ, মনোবিকারগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ কিংবা অন্য সকলের কাছে ঘৃণ্য শরীর লাভ করে, তা হলে তার পক্ষে জাগতিক সুখশান্তির অতি সামান্যই আশা থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই, অবশ্য, যে অবস্থা ঘটে, তা নিতান্তই অস্থায়ী হয়। কোনও মানুষ অপরূপ মনোহর শরীর লাভ করলেও তার উল্লাস করা অনুচিত, কারণ অচিরেই মৃত্যু এসে তেমন উন্মাদনাময় মর্যাদার অবসান ঘটাবে। ঠিক তেমনই, যেজন কোনও ঘৃণ্য অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, তারও অনুশোচনা করা অনুচিত, কারণ তার দুঃখভোগও অস্থায়ী। রূপবান মানুষ আর কুৎসিৎ মানুষ, ধনী এবং দরিদ্র, সুশিক্ষিত এবং নির্বোধ সকলেরই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা তাদের নিত্য স্বরূপ অবস্থায় উন্নীত হতে পারে, যার অর্থ হল—এই জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চিন্ময় গ্রহলোকমণ্ডলীতে বসবাসের সুযোগ লাভ। মূলতঃ জীবমাত্রই অকল্পনীয়ভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত, ধনৈশ্বর্যবান, এবং এমনই শক্তিধর যে, তার চিন্ময় শরীর অনন্তকাল যাবৎ জীবিত থাকে। কিন্তু আমরা নির্বোধের মতো এই নিত্য শাশ্বত, পরম আনন্দময় মর্যাদা অবহেলায় বর্জন করি, কারণ আমরা নিত্য শাশ্বত জীবনের শর্ত পূরণ করতে অনীহা বোধ করি। শর্তটি হল এই যে, জীবকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবক হতে হবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার আনন্দ জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও নিবিড়তম সুখতৃপ্তির চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক, তবু আমরা নির্বোধের মতোই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সাথে আমাদের প্রেমময় সুসম্পর্ক ছিন্ন করি এবং নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে জাগতিক আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা অহমিকার পরিবেশের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনভাবে ভোগাকাঙ্ক্ষী হতে সচেষ্ট হই।

কেউ যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুন্নত স্বর্গীয় গ্রহমণ্ডলীতে উপস্থিত হতেও পারে, তবু নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের মাঝে তাকে বিড়ম্বিত হতে হবে। এই পার্থিব জগতে প্রত্যেক বদ্ধ জীবই অতীব মহাপুরুষ হয়ে উঠতে চায়। তাই যে সব সমকক্ষ

মানুষদের একই বাসনা অভিলাষ থাকে, তাদের দ্বারা নিত্যনিয়ত বিড়ম্বিত হতেই হয়। এই পরিস্থিতিকে সচরাচর জাগতিক জীবনধারণের জন্য ইঁদুরের মতো নিরন্তর অস্থিরভাবে ছোটাছুটি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এমন কি স্বর্গলোকেও স্বর্গীয় মান-মর্যাদার জন্য ঐ ধরনের 'ইঁদুর-দৌড়' চলতে থাকে। যেহেতু কিছু মানুষ অবধারিতভাবেই আমাদের নিজেদের সাফল্য অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, তাই আমরা যার জন্য সংগ্রাম করেছি, তারই সুফল অন্যজনে ভোগ করছে দেখে তাদের উপর ঈর্ষায় আমাদের হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। আর যেহেতু আমাদের সমগ্র পরিবেশ মর্যাদাই অস্থায়ী, তাই স্বর্গলোকেও আমরা ভয়, উদ্বেগ, এবং মৃত্যুর সম্মুখীন অবশ্যই হয়ে থাকি। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা ভারি সুন্দর। ছোট ছোট রাজাদের ধনসম্পদ, শক্তিমত্তা এবং যশমর্যাদার জন্য তাদের প্রজাবর্গের প্রশস্তিতে সেই সব রাজারা উল্লসিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ঐ রাজারাই আবার নিজেরা অন্যান্য রাজাদের কাছ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আক্রমণের আতঙ্কে নিত্যনিয়তই ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-বিরক্তি এবং ভয়-আতঙ্কে দগ্ধ হতে থাকে। ঠিক সেইভাবেই, আধুনিক রাজনীতিবিদরাও তথা রাষ্ট্রনায়কেরা ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ আর ভয় আতঙ্কের মাঝে নিত্যনিয়ত বিব্রত হয়ে রয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বদ্ধ জীব জাগতিক সুখভোগ ও দুঃখ পরিহারের আগ্রহাতিশয্যে মৈথুন সম্পর্কাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং তাই ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের কঠোর পরিশ্রমের মাঝে আত্মসমর্পণ করে। অবশ্য, যারা জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ, তারা ঐ ধরনের স্থূল জাগতিক প্রচেষ্টাদির চরম ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পত্তি এই সবই অস্থায়ী কল্পনাট্যস্বরূপ, এবং সেই সবই বাস্তবে সুপ্রতিভাত মনে হলেও, কোনটিই মানুষকে তার ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পরিপূর্ণ সুখতৃপ্তি এনে দিতে পারেই না। এই পৃথিবীতে অর্থসম্পদ অর্জন করতে হলে মানুষকে বাস্তবিকই তার নিজের আত্মসত্ত্বাকে বাধ্য হয়ে নিধন করতে হয়। জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তৃপ্তি আহরণের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, কারণ নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্থায়ী বস্তু-বিষয়াদি অবলম্বনে অস্থায়ী ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে, ঐ সব ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে হয়। যখন বদ্ধ জীব তার অভীষ্ট লক্ষ্য সাধন করে, তখন সে গর্ববোধ করে এবং অন্য সকলের কাছে জাহির করতে থাকে যেন তার সমস্ত সাফল্যই চিরস্থায়ী। আর যখন তা হারিয়ে যায়, তখন শোকে দুঃখে হতাশায় নিমজ্জমান হয়ে পড়ে। ঐভাবে নিজেকেই সকল কৃতকর্মের কর্তা মনে করা নিতান্তই হীনবুদ্ধির লক্ষণ, তার কারণ

প্রকৃতপক্ষে জড় শরীরটির মধ্যে বদ্ধ জীব শুধুমাত্র ইচ্ছাই পোষণ করে থাকে মাত্র। তার আবরণস্বরূপ শরীরটিই শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে জড়া প্রকৃতির শক্তির দ্বারা চালিত হতে থাকে। প্রভু এবং ভৃত্য, পিতা এবং পুত্র, পতি এবং পত্নীর সম্বন্ধ সম্পর্ক থেকে শুভেচ্ছা এবং সেবা বিনিময় হতে থাকে, যা থেকে জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের চেতনা পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ধরনের অনিত্য ভক্তিপরায়ণতা তথা সেবা অভিলাষ কখনই আত্মার নিত্য শাশ্বত কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারে না। ঐ ধরনের অনিত্য স্বল্পস্থায়ী সুখতৃপ্তি উপভোগের মাধ্যমে, মায়া সকল বদ্ধ জীবকে জড়া প্রকৃতির যথাযথ প্রাপ্তিযোগের দ্বারা পার্থিব জগতের সর্বত্র বিচরণ করাতে থাকে। কর্মবন্ধনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধি অনুসারে, জীবমাত্রেই সুখ এবং দুঃখ লাভ করতে থাকে। কেউ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুখ লাভ করতে পারে না—যত কঠিন উপায়ে কিংবা যতদিন ইচ্ছা পরিশ্রম করলেও তা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাদের বুদ্ধি নির্মল, তারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করাই কর্তব্য মনে করে এবং স্থায়ী জাগতিক সুখ অর্জনের হাস্যকর প্রচেষ্টা বর্জন করে, কারণ ঐ ধরনের প্রচেষ্টা নিতান্তই কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করবার মতোই তুলনীয় অপকর্ম মাত্র।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরুদেব; **প্রপদ্যেত**—আশ্রয় গ্রহণকারী; **জিজ্ঞাসুঃ**—অনুসন্ধিৎসু; **শ্রেয়ঃ উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বিষয়ে; **শাব্দে**—বেদ সম্ভারের মধ্যে; **পরে**—পরমেশ্বরের মাঝে; **চ**—এবং; **নিষ্ণাতম্**—উত্তমরূপে জ্ঞাত; **ব্রহ্মণি**—(এই উভয় বিষয়ে) পরম তত্ত্বের; **উপশম্-আশ্রয়ম্**—পার্থিব বিষয়কর্মাদি থেকে নিরাসক্তিতে অবিচল থেকে।

অনুবাদ

সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল

জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *শাব্দে* কথাটির দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার এবং *পরে* শব্দটির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝানো হয়েছে। যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে অবশ্যই *নিষ্ণাতং* অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে গভীরভাবে অবগাহন করতে হবে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। পরমেশ্বর শ্রীভগবান সম্পর্কে শাস্ত্রসম্মত জ্ঞান এবং বাস্তব উপলব্ধি ব্যতীত গুরু নামে অভিহিত কোনও মানুষ তাঁর শিষ্যবর্গের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসন করতে অক্ষম হন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে পরমাগ্রহী শিক্ষার্থীকে তার নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের দুরূহ কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করতে অক্ষম হন। বেদশাস্ত্রাদি এবং শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে জানার লক্ষণ *উপশমাশ্রয়ম্।* অন্যভাবে বলতে গেলে, যথার্থ সদ্‌গুরু তাঁকেই বলা হয়, যিনি জড়জাগতিক সমাজ, প্রীতিবন্ধনাদি ও প্রেম-ভালবাসার আড়ম্বর মায়ামোহ থেকে নিবৃত্ত হতে পেরেছেন।

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে, মানুষ অবশ্যই মহাবুদ্ধিমান, শক্তিমান রাজনীতিক নেতা, স্নেহপরায়ণ পিতা হয়ে অনেকগুলি রূপবান এবং স্নেহাসক্ত সন্তানাদি লাভ করতে অভিলাষী হয়, সর্বজনসম্মানিত কল্যাণকর্মী কিংবা অতি উচ্চপ্রশংসিত এবং সফল ব্যবসায়ী হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক মর্যাদার কোনটিরই স্থায়ী ভিত্তি থাকে না, তা ছাড়া সেগুলির মাধ্যমে স্থায়ী সুখের ব্যবস্থাও হয় না, কারণ মানুষ তার জাগতিক দেহটিকেই আপন স্বরূপ মনে করার ফলে যে প্রাথমিক ভ্রান্তি গড়ে ওঠে, তার ফলে কোনও দেহসুখই স্থায়ী হয় না।

মানুষমাত্রেই অনায়াসে বুঝতে পারে যে, তার সত্ত্বাটি জাগতিক দেহ নয়, সেটি তার চেতনসত্ত্বা মাত্র। কোনও মানুষের শরীরের একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়ে গেলে, তখনও জীবিত প্রাণময় সত্ত্বারূপে তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশেষে, মৃত্যুকালে সমগ্র শরীরটি বিনষ্ট হয়, এবং জীব নতুন শরীর লাভ করে। মানুষের চেতনস্বরূপ অস্তিত্বের প্রাথমিক ধারণাটিকে বলা হয় আত্ম উপলব্ধি। তবে এই প্রাথমিক জ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে একটি বিশদ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে যার দ্বারা আত্মা বুঝতে পারে কিভাবে ৮৪,০০,০০০ জাগতিক প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে আত্মা আবর্তিত হতে থাকে। আর যদি জীব নিতান্তই জড় দেহ না হয়ে চেতন সত্ত্বাই হয়, তা হলে অবশ্যই শেষ অবধি তাকে কোনও এক উচ্চতর পর্যায়ে তার যথার্থ মর্যাদায় পুনরধিষ্ঠিত হতে হবে।

শাস্তি বলতে পুরস্কারও বোঝায়; শক্তিমান পুরুষ যিনি শাস্তি দিতে পারেন, তিনি পুরস্কার দিতেও পারেন। সুতরাং, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন বেদনাময় জড়জাগতিক দেহ ধারণে বাধ্য হয় যে-জীব, তার জন্য শাস্তির বিধান যেমন আছে, তেমনি যুক্তসঙ্গতভাবেই তার জন্য পুরস্কারের আয়োজনও নিশ্চয়ই থাকে। যদিও আমরা ভ্রান্তিবশত পার্থিব সুখতৃপ্তিকে জীবনের চরম পুরস্কার বলে বিবেচনা করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক সুখভোগ এক ধরনের শাস্তিভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেহেতু এর মাধ্যমেই মানুষ প্রলুব্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতেই থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হিংসাত্মক কারাবাসীদের নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, আর ভদ্র আচরণকারী কারাবাসীদের অনেক ক্ষেত্রেই কারাধ্যক্ষের বাগানে কিংবা গ্রন্থাগারে কাজ করাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তেমনই, জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উচ্চমান এবং নিম্নমানের পার্থক্য থাকলেও তা থেকে এমন ধারণা করা অনুচিত যে, জীবকে ঐভাবে পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, বরং তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করাই আবশ্যক যে, জাগতিক জীবন ধারণের ফলে শাস্তি ভোগের সেটাই স্বাভাবিক বৈপরীত্য মাত্র। যথার্থ পারিতোষিক বলতে বোঝায় ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দ জীবন লাভ—যেখানে কোন শাস্তিবিধান হয় না। ভগবদ্ধাম বোঝায় বৈকুণ্ঠধাম, অর্থাৎ যেখানে অকুণ্ঠভাবে আনন্দ পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেই চিন্ময় রাজ্যে কোনও শাস্তিবিধান হয় না, সেটি নিত্য বিকাশমান সুখ-শান্তির রাজ্য।

যে কোনও সদ্গুরু এই সকল বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও কল্পনাশ্রিত ধারণা ব্যক্ত না করে প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে তাঁর পরিণত বুদ্ধিমত্তা সহকারে উপলব্ধির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই বিতরণ করে থাকেন। সেই বেদজ্ঞান শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপারই শাস্ত্রীয় অভিব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। তাই শ্রীভগবান স্বয়ং এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩) লেখা আছে—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপঃ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" অতএব সদ্গুরুর অবশ্য কর্তব্য তাঁর শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তির নিত্যসেবায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতি প্রত্যুষে জননী তাঁর সন্তানের ঘরে ঢুকে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, যাতে সে স্কুলে যেতে পারে। শিশুসন্তান ঘুম থেকে জেগে উঠতেই চায় না, কিন্তু মা তাকে জোর করে

ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং লেখাপড়া শেখার জন্য তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেন। ঠিক সেইভাবেই, সদ্‌গুরু নিদ্রাকাতর জীবকে জাগিয়ে তোলেন এবং তাকে গুরুকুল শিক্ষাকেন্দ্রে অর্থাৎ পারমার্থিক গুরুদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দেন, যেখানে যথার্থ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তার শিক্ষাদীক্ষা হতে পারে।

যদি শিষ্যের মনে কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল্য মর্যাদা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তা হলে সদ্‌গুরু উত্তম জ্ঞানালোকে তার সেই সকল সন্দেহ অবশ্যই নিরসন করবেন। যিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা বৈদিক জ্ঞান সম্পদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধমনা, তিনি কখনই সদ্‌গুরু হতে পারেন না। অথচ,

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

যে কোনও মানুষ যে কোনও সামাজিক কিংবা আর্থিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন, যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন, তা হলেই সদ্‌গুরু হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

"*ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ রয়েছে, তা সকলকে শেখাও। এইভাবেই এই জগতে প্রত্যেক মানুষই পারমার্থিক সদ্‌গুরু হয়ে সকলকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮) শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ এবং অনুশাসন অনুসারেই সদ্‌গুরু হওয়া যায়—প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতা দিয়ে তা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলাই যে কোনও সদ্‌গুরুর যথার্থ কর্তব্য। কোনও জ্ঞানী গুণী ধ্যানী সন্ন্যাসীর যদি শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজেরই যথার্থ সম্বন্ধ সম্পর্ক না গড়ে উঠে, তা হলে শিষ্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ সৃষ্টি করার কোনও ক্ষমতাই তাঁর থাকতে পারে না। যদিও বহু ক্রীড়াকৌশল বিশারদ নানা শরীরচর্চা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নানা ধরনের শরীরিক কসরৎ দেখে বিপুল প্রশংসা করতে থাকে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য সেই ধরনের কলাকৌশলের দর্শক মাত্র নন, এবং যোগচর্চার নামে যে সকল নির্বোধ মানুষগুলি শারীরিক কসরৎ দেখাতে চায়, তাদের তিনি বাহবা দেন না। তা ছাড়া, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বকথার নীরস প্রচেষ্টাতেও তিনি প্রীতিলাভ করেন না, সেই বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর নিজস্ব অভিমত *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৪) উল্লেখ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, পারমার্থিক গুরুদেব যদি তাঁর শিষ্যবর্গের মনে শ্রেষ্ঠজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহাদি নিরসন করতে না পারেন, তা হলে শিষ্য ক্রমশই পারমার্থিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। কারণ কোনও ভণ্ড গুরু যথার্থই শিষ্যকে *রসোবর্জং রসোঽপ্য অস্য* নীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ পরিচয় প্রদান করতে পারে না বলেই, শিষ্য কৃষ্ণসঙ্গের পরমানন্দ অর্জন করতে না পেরে আবার পার্থিব সুখান্বেষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেই ধরনের দুর্বলমনা গুরুর দুর্বলচিত্ত শিষ্য ক্রমশই হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হতে থাকবে আর আবার বিবিধ কল্পনাবিলাস এবং অলীক চিন্তার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ মনে করে নারী সম্ভোগে, অর্থ বিলাসের মতো মায়ামোহময় কার্যকলাপে আকৃষ্ট হতে উদ্যোগী হবে।

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আরও লক্ষণাদি *শ্রীউপদেশামৃতে* (১) নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগম্ উদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেতো ধীরঃ
সর্বাম্ অপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যেরবেগ, ক্রোধেরবেগ, মনেরবেগ, জিহ্বারবেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ দমন করতে সক্ষম হন, তিনি সমগ্র জগতের শিষ্যবর্গের গুরু হয়ে উঠার যোগ্যতা অর্জন করেন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *উপশমাশ্রয়মং ক্রোধলোভাদি অবশীভূতম্*—পারমার্থিক সদ্‌গুরু সচরাচর রাগ, লোভ এবং কামক্রিয়ার বশীভূত কখনই হন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত এই যে, পার্থিব জীবন ধারণের ব্যর্থতা সম্পর্কে যিনি উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তিনি যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে পারেন। পূর্ববর্তী দু'টি শ্লোকে পার্থিব এবং স্বর্গীয় ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যর্থতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে যার উপলব্ধি হয়েছে, সদ্‌গুরুর কাছে তারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। যোগ্য পারমার্থিক গুরু মাত্রই বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত চিন্ময় গ্রহমণ্ডলী থেকে বিচ্ছুরিত দিব্য শব্দতরঙ্গ প্রচার করে থাকেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যে সকল চিন্ময় গ্রহরাজিতে অধিষ্ঠান করেন, সেগুলির অধিবাসীরা নিশ্চয়ই বধির এবং বাক্‌শক্তিহীন জীব নন; তাঁরা নিয়ত অনন্ত চিন্ময় সদানন্দময় জীবনধারার মাধ্যমে নিত্য অবগাহন করছেন। আর, পারমার্থিক সদ্‌গুরু সৎ-চিৎ-আনন্দময় সেই ধ্বনিমাধুর্য তাঁর শিষ্যের

কাছে এনে দিতে পারেন। বেতারযন্ত্র যেমন পার্থিব সংবাদ সম্প্রচারিত করে, তেমনই যথার্থ সদ্‌গুরু বৈকুণ্ঠ থেকে সম্প্রচারিত দিব্য ভাবধারা শিষ্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এই সিদ্ধান্তটি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন—*গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন*। পারমার্থিক গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন যে-কৃষ্ণনাম, তা-ই শিষ্যের কাছে সম্প্রচার করে থাকেন। পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে জানাতে চেষ্টা করেন যে, প্রত্যেক জীবমাত্রই গুণ মর্যাদায় পরমেশ্বর ভগবানের সমান হলেও পরিমাণে বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন এবং সেই কারণেই শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনে তাঁর শিষ্যকে নিয়োজিত রাখেন। শ্রীভগবানের সাথে জীব গুণগতভাবে অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই তাদের মাঝে নিত্যকালের প্রেমময় সম্পর্ক রয়েছে। আর জীব ভিন্ন সত্ত্বাবিশিষ্ট বলেই, সেই সম্পর্কটি চিরকালই প্রেম-ভালবাসা-সেবার বন্ধনে সম্পৃক্ত থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, কেউ যথার্থ গুণবান সদ্‌গুরু লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা সত্ত্বেও যদি সে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম কিংবা নিজের পার্থিব প্রগতির উদ্দেশ্যে মানসিক জল্পনা-কল্পনায় অভিনিবিষ্ট হয়, তা হলে পারমার্থিক সুখ-শান্তি অর্জনের পথে তার বিঘ্ন সৃষ্টি হবেই। তবে কোনও নিষ্ঠাবান শিষ্য যদি কোনও যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণকমলে নিষ্ঠাভরে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে যথার্থ চিন্ময় জ্ঞান ও আনন্দ লাভের মাধ্যমে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি লাভের পথে তার কোন বিঘ্নই সৃষ্টি হবে না।

শ্লোক ২২

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে (পারমার্থিক গুরুর সান্নিধ্যে); **ভাগবতান্ ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তি প্রেম অনুশীলনের তত্ত্ববিজ্ঞান; **শিক্ষেৎ**—শিক্ষা লাভ করা উচিত; **গুরু-আত্ম-দৈবতঃ**—পারমার্থিক গুরুদেব যে-শিষ্যের কাছে তার জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ হয়ে থাকেন; **অমায়য়া**—মায়াময় চাতুর্যশূন্য মনে; **অনুবৃত্ত্যা**—বিশ্বস্ত সেবার মাধ্যমে; **যৈঃ**—যার সাহায্যে (ভক্তি সেবা অনুশীলনের); **তুষ্যেৎ**—তুষ্ট করা যায়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মদঃ**—যিনি আপন সত্তা প্রদান করে থাকেন; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে আপন জীবনের পরম আশ্রয় এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ স্বীকার করার মাধ্যমে, তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি

প্রক্রিয়াদি শিক্ষা লাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি সকল জীবাত্মার পরমাত্মারূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে নিজেকে বিকশিত করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। অতএব, কোনও রকম ছলচাতুর্য বর্জন করে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষালাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য এবং সেইভাবে নিষ্ঠাভরে পরম আনুকূল্য সহকারে ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চা করলে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি লাভ করেন এবং তখন তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে ধরা দেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুসারে, শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেন, সেই বিষয়ে বলি মহারাজের ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে যথার্থতঃ প্রতিপন্ন করেছেন। বলি মহারাজ তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী সমগ্র রাজ্য ভগবান শ্রীবামনদেবের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবামনদেব এইভাবে বলি মহারাজের নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সেবার দৃষ্টান্তে এতই প্রীতিলাভ করেছিলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং বলি মহারাজের প্রাসাদের দ্বাররক্ষক হয়ে থাকেন এবং পরে বলি মহারাজকে পুনরায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর করা হয়েছিল।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত এই যে, পারমার্থিক গুরুদেবকে শিষ্যের জীবনস্বরূপ আত্মারূপে মর্যাদা দিতে হয়, কারণ যথার্থ সদ্‌গুরু যখনই কাউকে শিষ্যরূপে দীক্ষা প্রদান করেন, তখন থেকেই তার প্রকৃত জীবনধারার সূচনা হয়ে থাকে। স্বপ্নের মাঝে মানুষ নানা ধরনের আপাতসুন্দর চমৎকার কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অলীক পরিচয় লাভ করে থাকতে পারে, তবে জেগে উঠলে তখনই তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা শুরু হয়। তেমনই, পারমার্থিক গুরুদেব শিষ্যকে পারমার্থিক জীবনচর্যায় উজ্জীবিত করেন বলেই, যথার্থ শিষ্য উপলব্ধি করতে থাকে যে, তার জীবনের প্রধান ভিত্তি গড়ে উঠছে তার পারমার্থিক গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকল প্রকার আনন্দের পরম উৎস, এবং তাই শ্রীভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, তখন সেই ভাগ্যবান ভক্ত সর্বোত্তম চিন্ময় আনন্দ সুখে নিমজ্জমান হয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নরূপ শ্রুতিমন্ত্রও রয়েছে—*আনন্দাদ্ ধীমানি ভূতানি জায়ন্তে।* "সর্বময় আনন্দসুখ সম্পন্ন পরমেশ্বরের কাছ থেকেই এই সকল জীব জন্মলাভ করেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবান যখন নিজেকে তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মাঝে সমর্পণ করে দেন, তখন সেই ভাগ্যবান ভক্ত বাস্তবিকই শ্রীভগবানকে দর্শন করতে পারে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে এবং তাঁর সেবায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, নিজের পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে কোনও শিষ্যেরই পার্থিব ব্যক্তি কিংবা নিজের সমকক্ষ মানুষ বলে মনে করা কখনও উচিত নয়। পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র পাদপদ্মাশ্রিত পুরুষরূপে বিবেচনা করা শিষ্যের কর্তব্য। কোনও শিষ্যেরই নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে তাঁর নিজের সেবাকার্যে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর উপরে আধিপত্য বিস্তার করার প্রচেষ্টা এবং তাঁর মাধ্যমে কোনও পার্থিব লাভ অর্জনে প্রবৃত্ত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। যে শিষ্য বাস্তবিকই পারমার্থিক অনুশীলনে অগ্রসর হতে থাকে, সে ক্রমশই পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর সেবায় আগ্রহী হতে থাকে, এবং তার ফলেই শিষ্য ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পরমানন্দময় সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে থাকে।

নিষ্ঠাবান শিষ্যের পারমার্থিক প্রগতির আনুকূল্যে চারটি প্রাথমিক উপচারের কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্ ॥

"[১] পারমার্থিক সদ্গুরুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয়গ্রহণ, [২] পারমার্থিক গুরুদের কাছে দীক্ষিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে কিভাবে ভক্তিসেবা নিবেদন করতে হয়, তার অনুশীলন, [৩] বিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের আদেশাদি প্রতিপালন, এবং [৪] পারমার্থিক সদ্গুরুর মাধ্যমে তাঁর নির্দেশে মহান আচার্যবর্গের [শিক্ষাগুরু সকলের] পদাঙ্ক অনুসরণ।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/৭৪) এই সকল প্রাথমিক কর্তব্যকর্ম যিনি প্রতিপালন করেছেন, তিনিই *শ্রীমদ্ভাগবত* আস্বাদন করবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের যথাযথ দিব্য শব্দতরঙ্গ যখন কেউ শ্রবণ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনাকল্পনার বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সুখ ও সন্তোষ লাভ করেন।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

"শুধুমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাভক্তির অনুভব অচিরে জাগ্রত হয়ে সকল প্রকার শোকদুঃখ, মায়ামোহ এবং ভয়ভীতির জ্বালা নিবারিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৭)

ভাগবতের দিব্য ধ্বনি শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবণতা যিনি সুচারুভাবে জাগ্রত করতে সক্ষম, তেমন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছেই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা উচিত। এইভাবে অপ্রাকৃত পারমার্থিক প্রামাণ্য শ্রবণ-উপযোগের নাম *ভাগবত-ধর্ম*। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মধ্যেও এই প্রতিষ্ঠানের ধর্মপ্রচারমূলক কর্মধারা প্রসঙ্গে বহু সহস্র প্রামাণ্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমে এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করার ফলে, সংঘের সদস্যবৃন্দ বহু শোক, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুযায়ী, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দিব্য ধ্বনি তরঙ্গের সম্যক উপলব্ধি যাঁদের লাভ হয়, তাঁরা এই স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত *হংসগীতা* ভাষ্য অনুসারে *ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাস* আশ্রম গ্রহণ করতে পারেন। বৈষ্ণব নামে অভিহিত মানুষ কায়মনোবাক্যে কঠোর সদাচার অবলম্বনে অহেতুক অবহেলা করলে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে যথার্থ আশ্রয় লাভ করতে পারে না। ঐ ধরনের কোনও অহেতুক ইন্দ্রিয়সম্ভোগী মানুষ যদি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মতো পোশাক এবং দণ্ড ধারণের ভেক-প্রদর্শন করে, তবুও কৃষ্ণপ্রেম অর্জনের বাঞ্ছিত ফল লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে কোনও সামান্য মাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মানসিক জল্পনা থেকে শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে বিরত থাকতে হয়, এবং তার পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর আদেশ-নির্দেশাদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিপালন করতে হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মহিমামণ্ডিত মর্যাদা সদাসর্বদা স্মরণের মাধ্যমে, শিষ্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে।

শ্লোক ২৩

সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধুষু ।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥ ২৩ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; **মনসঃ**—মনের; **অসঙ্গম্**—অনাসক্তি; **আদৌ**—প্রথমে; **সঙ্গম্**—সঙ্গলাভ; **চ**—এবং; **সাধুষু**—সাধুজনের সঙ্গে; **দয়াম্**—দয়া; **মৈত্রীম্**—সখ্যতা; **প্রশ্রয়ম্**—শ্রদ্ধাভক্তি; **চ**—এবং; **ভূতেষু**—সকল জীবের জন্য; **অদ্ধা**—এইভাবে; **যথা উচিতম্**—যেভাবে সম্ভব।

অনুবাদ

নিষ্ঠাবান শিষ্য সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে মনঃসংযোগ ছিন্ন করতে অবশ্যই শিখবে এবং তার পারমার্থিক গুরুদেব আর অন্যান্য শুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের সঙ্গ অনুশীলন করতে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট হবে। তার চেয়ে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি তাকে কৃপাময় হতে হবে, সমমর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে এবং উচ্চতর পারমার্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি বিনম্র সেবা মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। এইভাবেই সকল জীবের সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করতে তার শেখা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য *গরুড়পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাঁরাই দেবতা, মহর্ষি কিংবা পুণ্যবান পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সকলকেই *সন্তঃ* অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলা হয়ে থাকে। *ভগবদ্‌গীতা* অনুসারে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ*—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে যে সকল জীব সংগ্রাম করছে, তাদের অধিকাংশেরই আলোচনা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে বর্ণিত *বর্ণাশ্রম* সংস্কৃতি রূপে উল্লিখিত আছে। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে ঐ ধরনের বদ্ধ জীবগণকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পুণ্যকর্মের মাধ্যমেই পার্থিব সুখ অর্জন করা যেতে পারে। এই বিবেচনায়, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে সর্বাধিক পুণ্যবান জীবগণই দেবতা রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। ঋষিবর্গ, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহর্ষি যোগীগণ যাঁরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন গ্রহে পরিভ্রমণ করতে পারেন এবং যাঁরা যৌগিক ক্ষমতার অনুশীলন করে থাকেন, তাঁদের দেবতাগণের অপেক্ষা কিছু নিম্নস্তরের বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর, পৃথিবীতে যে সব মানুষ যথাযথভাবে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পালন করে থাকেন, তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সর্বনিম্ন পর্যায়ের *সন্তঃ* বা সাধুপুরুষ মনে করা হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্ত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৬) বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোনও অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অর্থাৎ সবরকমের জড় জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, কোনও বৈষ্ণব ভক্ত ভক্তিযোগের বিধিবদ্ধ আচরণ থেকে অধঃপতিত না হন, তিনি জড়া প্রকৃতির

ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্ত ভাবে তাঁর ভক্ত অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছেন কিভাবে মায়ার মোহময় সৃষ্টি জড় জাগতিক ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থকো যায় *(নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন)*। তবে *ভগবদ্‌গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৪০) শ্রীভগবান বলেছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥

"এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে বা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কোনও জীব নেই, যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত।" সুতরাং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের কলুষতা থেকে দেবতারাও মুক্ত নন, সেক্ষেত্রে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বাস্তবিকই গুণাতীত, অর্থাৎ মায়ার প্রভাব মুক্ত হয়ে উঠেন।

অতএব, শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অর্থাৎ উত্তম অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গ লাভের অনুশীলন করাই মানুষের কর্তব্য, যে কথা আগেই (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১) বলা হয়েছে—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত।"

অপর পক্ষে, কোনও মানুষ জড় জাগতিক ভোগসুখে আসক্ত হয়েও বাহ্যিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতে থাকলেও তার সঙ্গ বর্জন করাই কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজন বিজ্ঞম্ অনন্যম্ অন্য
নিন্দাদিশূন্যহৃদয়ম্ ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

কোনও জীব শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করলে তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু যে কোনও জড় জাগতিক ভোগসুখান্বেষী, বিশেষত মৈথুনাসক্ত মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পরিহার করাই উচিত। *তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্*। যদি কেউ এমন কোনও ভোগাসক্ত মানুষের সঙ্গলাভ করে, যে মানুষ নারীসঙ্গে আসক্ত, তাহলে সেই ধরনের সঙ্গলাভের ফলে মানুষকে সুনিশ্চিত ভাবে নরকগামী হতে হবে।

তবে যদি কোনও জড় জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষ কোনও ভাবে পারমার্থিক উন্নতি লাভের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কাছে আসে, তা হলে সেই উত্তম ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে উন্নতি লাভের অনুকূল বিবেচনা করে কৃপাপূর্বক তাঁর সঙ্গদানের মাধ্যমে তেমন ভোগী মানুষকে উপকৃত করতেও পারেন। জাগতিক ভোগ সুখে আসক্ত মানুষও এই ধরনের সঙ্গলাভের ফলে ক্রমশ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতেও পারে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের কোনও জাগতিক ভোগাসক্ত মানুষকে যদি নিয়োজিত করতে না পারা যায়, তবে উত্তম ভক্তের পক্ষে তেমন সঙ্গ অনুশীলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে—

> *বিশেষতঃ স্বোত্তমেষু বিনা সঙ্গং ন মুচ্যতে ।*
> *স্বনীচেষু তু দেবেষু বিনা সঙ্গং ন পূর্যতে ॥*

"শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ বিনা মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না। আর অধম অবস্থায় যারা রয়েছে, তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করলে মানুষের জীবন অনর্থক প্রতিপন্ন হবে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কৃষ্ণবাণী প্রচার ও প্রসারের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা পারমার্থিক প্রগতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছেন, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ সুখে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভাগবৎ-ধর্মকথা প্রচারের আন্দোলনে যাঁরা নিরুৎসাহিত বোধ করে কৃপাগুণ অনুশীলনে অবহেলা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের জীবনে *পূর্যতে* শব্দটির দ্বারা এখানে বর্ণিত অপ্রাকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হতেও পারে না। পারমার্থিক সুখ অনুভূতির পূর্ণতা অর্জন করতে না পারার ফলে, অবশ্যই ঐ ধরনের মানুষেরা যথেচ্ছ নারী সঙ্গের মাধ্যমে কিংবা অগণিত চটুল নাটক-উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা, এবং আরও অনেক কিছু পাঠ চর্চার ফলে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের মধ্যে দিয়ে যথেচ্ছ তৃপ্তি লাভের এবং

অনাবশ্যক মানসিক জল্পনা-কল্পনায় তাদের জীবন ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে, কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষ্ণ মহিমা প্রচারের কার্যক্রমের ফলে *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্*, পরমানন্দের ক্রমবর্ধমান সাগর সৃষ্টি হতে থাকে। কৃষ্ণকথা তথা ভাগবত-ধর্ম প্রচারের কার্যকলাপ দয়া-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে অর্থাৎ যারা পতিত অবস্থায় পথভ্রান্ত, তাদের প্রতি কৃপাপূর্বক পথ প্রদর্শন করতে হয়। যাঁরা বাস্তবিকই এইভাবে ভাগবত-ধর্ম প্রচার করে চলেছেন, তারা ক্রমশ অন্যান্য প্রচারকদের সঙ্গেও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় *মৈত্রীম্*, অর্থাৎ সমপর্যায়ভুক্ত সকলের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা। এই ধরনের ভাগবত-কথা প্রচারমূলক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার সামর্থ্য ছাড়াও কৃষ্ণবাণী বিতরণের অনুকূল যথার্থ পথনির্দেশ আসে *প্রশ্রয়ম্* নীতি অর্থাৎ দীক্ষাগুরুর মতো পারমার্থিক গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে বিনম্র সেবা নিবেদনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। যদি কোনও ব্যক্তি যথার্থে সদ্‌গুরুর অধীনে এবং সহযোগী প্রচারক মণ্ডলীর সাথে মিলেমিশে সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকার্য সম্পন্ন করতে থাকে, তা হলে *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তার ফলে *সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্* অর্থাৎ শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরাসক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধ হয়'। ভগবদ্ভক্তদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, মানুষ জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতে পারে যাতে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

পাপপূর্ণ জীবনে আসক্ত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ কেউ যদি অবহেলা করে, তা হলে অবশ্যই সে *কৃপাময়* মানুষ নয়। পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ যেব্যক্তি তার নিত্যসত্তা অবহেলা করে থাকে এবং তার পরিবর্তে নিজেকে 'আমি আমেরিকান', 'আমি রাশিয়ান', 'আমি ভারতীয়', 'আমি কৃষ্ণাঙ্গ', 'আমি শ্বেতাঙ্গ'—এমনি সব অনিত্য পরিচয়ে বিভ্রান্ত করতে থাকলে, মানুষ নিজেকেই নষ্ট করে এবং তাকে তখন আর *কৃপাময়* বলে বিবেচনা করা চলে না। ঠিক সেই ভাবেই, যারা মাছ, মাংস এবং ডিম ভক্ষণের জন্য প্রাণীহত্যা সমর্থন করে তাদের কখনই কৃপাময় বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, কেউ যদি অন্যের ক্ষতি না করে, তা হলে সে যথেষ্ট পুণ্যবান। কিন্তু যেহেতু আমরা এখন অজ্ঞতার মাঝে বাস করছি, তাই আমরা জানিনা আমাদের বর্তমান কাজকর্মের ফলে ভবিষ্যতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। অন্যকে

আঘাত দেওয়া হচ্ছে না এমন ধারণা অজ্ঞাতবশত গর্বভরে পোষণ করা হয় যেহেতু প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মবিধি সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারণা থাকে না, তবে সেই অজ্ঞতার ফলে কাউকে ধর্মপরায়ণ মানুষ বলা তো চলে না। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীভগবান স্বয়ং যে সকল আচরণবিধি উল্লেখ করেছেন, সেইগুলির প্রতি আত্মনিবিষ্ট হয়ে জীবনচর্যা অবলম্বন করলে তবেই মানুষ ধর্মপরায়ণ হতে পারে। জীবমাত্রেই যতক্ষণ তার নিজের মানসিক জল্পনা-কল্পনার বিলাসে গর্ববোধ করতে থাকে এবং যার ফলে সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষোভে তাড়িত হওয়ার মতো নিত্য বিচলিত হতে থাকে, ততক্ষণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করতেই পারে না। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বহু বৈচিত্রময় সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার উপরেই মানসিক জল্পনা-কল্পনা গড়ে উঠে এবং তার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের অধিকার লাভের সামর্থ্য থাকে না। তাই জাগতিক সঙ্গ অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যারা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরমেশ্বর ভগবানকে পরিতুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেবামগ্ন রয়েছে, তাদের সঙ্গ লাভ করতে হবে।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে যে-ব্যক্তি উত্তম অগ্রণী, তাঁর সাথেই সঙ্গলাভের চর্চা করা উচিত। কোন্‌জন কতখানি উত্তম অগ্রণী, তা অনুধাবন করতে হলে ইন্দ্রিয় উপভোগে তার কি ধরনের অনাসক্তি এবং সকলের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে তাঁর কতখানি কর্মশক্তি আছে, তা জানা চাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পায়েছে কেবা"—"বাস্তবিকই, বৈষ্ণবজনের সেবা-সাহায্যের উচ্চাশা যে বর্জন করে, তার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব কি ভাবে?" শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমাজের পাদপদ্মে সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, অচিরেই পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে মানুষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। জড় জাগতিক সুখ-তৃপ্তি উপভোগ বলতে যা কিছু বোঝায়, যা থেকে নানা ধরনের মৈথুন কল্পসুখ এবং নিজেকে ভগবানের মতোই নির্বিশেষ ভাবধারায় আপ্লুত মনে হতে থাকে, সেই সব কিছু কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে কৃপালব্ধ মানুষের কাছে অনাবশ্যক মনে হতে থাকে। সমগ্র জাগতিক সৃষ্টি যেন মহাসমুদ্রের অতি সামান্য বুদ্‌বুদের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রহ্মজ্যোতি নামে অভিহিত শ্রীভগবানের যে পারমার্থিক চিন্ময় অন্তরঙ্গা শক্তির উপরে জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রয়েছে। তা অনন্ত সমুদ্রের বিপুল শক্তির মাঝে একটি অতি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের সঙ্গেই তুলনীয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ কমলে সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, অনন্ত সুখ সাগরে মানুষ প্রবেশ করতে পারে এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস তথা সেবক রূপে স্বরূপ সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ

হয়। বৈষ্ণব জনের কৃপার সীমা-পরিসীমা থাকে না, এবং সেই কৃপা যিনি আস্বাদন করেছেন, তিনি জাগতিক সুখ-তৃপ্তি কিংবা মানসিক জল্পনা-কল্পনার মোহগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন না। বৈষ্ণব জনের কৃপাই সারবস্তু এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমান শক্তি সম্পন্ন, অথচ সমাজগোষ্ঠী, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রেম-ভালবাসার অলীক স্বপ্ন আর নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক জল্পনা-কল্পনা সবই নিতান্ত মায়াময় প্রতিপন্ন হয় এবং বদ্ধ জীবকে তা প্রতারণা করে আর নিত্যকালই হতাশা-ব্যর্থতার মাঝে আবদ্ধ করে রাখে।

শ্লোক ২৪

শৌচং তপস্তিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ২৪ ॥

শৌচম্—শুচিতা; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **তিতিক্ষাম্**—ধৈর্য; **চ**—এবং; **মৌনম্**—মৌনতা, **স্বাধ্যায়ম্**—বেদ অধ্যয়ন; **আর্জবম্**—সরলতা; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **অহিংসাম্**—অহিংসা; **চ**—এবং; **সমত্বম্**—সমভাব; **দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োঃ**—দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশে উপলব্ধি।

অনুবাদ

পারমার্থিক গুরুর সেবার উদ্দেশ্যে শিষ্যকে অবশ্যই শীত তাপ, সুখ-দুঃখের মতো জাগতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশের মাঝে শুচিতা, তপশ্চর্যা, ধৈর্য-তিতিক্ষা, বেদ অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এবং সমভাব চর্চা করতে হবে।

তাৎপর্য

শৌচতা অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্জগতের শুদ্ধতা বোঝায়। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে একবার এবং সম্ভব হলে দিনে তিনবার সাবান মেখে পরিষ্কার জলে স্নান করে বহির্জগতের মলিনতা থেকে শুদ্ধতা অর্জন করা উচিত। মানুষ যখন বৃথা গর্ব আর অহঙ্কার বোধের মলিনতা থেকে মুক্ত হয়, তখনই তাকে অন্তরের শুচিতা সম্পন্ন বলে মনে করা চলে। তপঃ অর্থাৎ তপশ্চর্যা বলতে বোঝায় যে, মনের অহৈতুক আবেগাদি সত্ত্বেও জীবনের যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে নিজেকে অবিচল রাখার জন্য মানুষকে মনঃসংযোগ করে চলতে হয়। বিশেষ করে, অগ্নিময় ক্রোধ এবং যথেচ্ছ মৈথুন সুখের জীবনধারা অবশ্যই মানুষকে সংযত করতে হয়। যদি মানুষ কাম, ক্রোধ এবং লোভের প্রবৃত্তিগুলি দমন না করে, তবে তার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা সে হারায়। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বিপুল সমস্যাদি সমাধানের পক্ষে মানব-জীবন এক সুবর্ণ সুযোগ। *বিষ্ণু পুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের ফল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে পারমার্থিক সার্থকতা অর্জন করতে পারে। ঠিক তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।* কাউকেই সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে হবে না কিংবা যোগির মতো বনে বসবাস করতেও হবে না; পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ তার সকল বৃত্তিমূলক কর্তব্য কর্মের ফল উৎসর্গ করার মাধ্যমে সার্থকতা অর্জন করতে পারে। ঠিক তেমনই, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, 'নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে'। যদি কেউ নিষ্ঠাভরে ও আন্তরিক সহকারে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের জপ করার মাধ্যমে নামাশ্রয় করে, তবে তার সাধারণ স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজ কর্মের পরিধির মধ্যেই পারমার্থিক চিন্ময় সাফল্য অবশ্যই ধীরে ধীরে অর্জন করতে থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত, যদি কোনও মানুষ সুসভ্য জীবন যাপনের বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিগুলির মাধ্যমে অবৈধ মৈথুনাচার, আমিষ ভক্ষণ, নেশাভাং এবং জুয়া খেলার মতো নিষিদ্ধ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ না করে, তা হলে অবশ্যই কাম ক্রোধের দুর্বার স্রোতে তাকে পরাভূত হতেই হবে, কারণ ঐগুলি মানুষের পারমার্থিক জীবনের বাস্তব চেতনা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং পার্থিব অনিত্য শরীরের কল্পনাটকীয় মোহমায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৩/৩৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

"এইভাবে কামরূপী চিরশত্রুর দ্বারা মানুষের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়ে যায়। এই কামনা বাসনা দুর্বারিত আগুনের মতোই চিরকাল অতৃপ্ত থাকে।" সুতরাং তপঃ অর্থাৎ শুদ্ধভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধন সম্পর্কে এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে

অবশ্যই তার বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সাধনের পথে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং কাম, ক্রোধ আর লোভের তাড়নায় অস্থির অধীর কিংবা অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে মত্ত হওয়া উচিত নয়।

তিতিক্ষাম্ অর্থাৎ 'সহনশীলতা' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পারমার্থিক জীবনচর্যায় নিয়োজিত সব মানুষকে অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কৃপাময় হতে হবে। পার্থিব জগৎ নানা প্রকার বিরক্তিকর এবং চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয় ব্যাপারে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকে, এবং তাই মানুষ বিশেষভাবে ক্ষমাগুণ সম্পন্ন হতে চেষ্টা না করলে প্রতিশোধমূলক মনোভাবে দূষিত হয়ে পড়তেই পারে আর তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা কলুষিত হয়ে যায়। *মৌনম্* অর্থাৎ "নীরবতা" বলতে বোঝায় যে, কোনও অর্থহীন কিংবা বালসুলভ বিষয়াদি সম্পর্কে কারও সমালোচনা করা অনুচিত, তবে অবশ্যই মানব জীবনের যথার্থ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, যথা নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনাই করা উচিত। সম্পূর্ণভাবে নীরবতা অবলম্বন করা অজ্ঞানতারই লক্ষণ; পাথর নীরব থাকে চেতনার অভাবে। যেহেতু প্রত্যেকটি পার্থিব বস্তুরই তার চিন্ময় প্রতিবর্তী সত্ত্বা বিরাজ করে, তেমনি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারেও নেতিবাচক এবং ইতিবাচক অনুশাসনাদি রয়েছে। বাকসংযমে নেতিবাচক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক অনুশাসন এই যে, বাকসংযমী মানুষকে অবশ্যই সদাসর্বদা কৃষ্ণবিষয়ক কথাই বলা অভ্যাস করতে হবে। *সততং কীর্তয়ন্তো মাম্*—তাই সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্র নাম, যশ, লীলা, পরিকর এবং অন্যান্য ভগবৎ-বিষয়ক গুণকীর্তনের মাধ্যমে তাঁকেই কথাবার্তার বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে যে, *শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।* সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শ্রবণ, ধ্যান এবং তাঁর আরাধনা করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে—*শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্।* সদ্‌গুরু *শাব্দে পরে* অর্থাৎ চিন্ময় জগতের স্বরূপ অভিব্যক্তির উপযোগী অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারঙ্গম হন। ধ্যানমগ্ন হওয়া এবং যোগাভ্যাস করবার কাল্পনিক ব্যবস্থাদির নির্বোধ প্রচারকদের বক্তব্য অনুসারে কোনও মানুষই কৃত্রিম উপায়ে শূন্য মস্তিষ্ক কিংবা বাক্যহারা হয়ে থাকতেই পারে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবাধর্মে মানুষকে এমন ওতঃপ্রোতভাবে আত্মস্থ হতে হবে এবং কৃষ্ণমহিমা বন্দনায় এমনই প্রেমময় ভাবধারায় আকৃষ্ট হতে হবে, যাতে একটি মুহূর্তও অনাবশ্যক বাক্য ব্যয়ের সময় না থাকে। *মৌনম্* শব্দটির এটাই যথার্থ তাৎপর্য।

স্বাধ্যায়ম্ মানে নিজ সামর্থ্য অনুসারে মানুষকে অবশ্যই বৈদিক সাহিত্য সম্ভার চর্চা করতে হবে এবং তা অন্যদেরও শেখাতে হবে। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, *জ্ঞান* ও *বিজ্ঞান* অর্থাৎ জ্ঞানের শাস্ত্রীয় উপলব্ধি এবং তার বাস্তব সম্মত প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ব্রাহ্মণের যোগ্যতা থাকা উচিত। বিশেষ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা-অভিলাষ পরিপূরণার্থে যে সমস্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা উচিত। সেইগুলি যথার্থ ব্রাহ্মণের আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অপ্রাকৃত এক অতুলনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থসম্ভার রচনা করেছেন। বাস্তবিকই সমগ্র বিশ্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা যথাযথ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* প্রমুখ গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে *স্বাধ্যায়ম্* নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তখন যথার্থ মনঃসংযোগী একান্ত আগ্রহী পাঠক মাত্রেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় ভাবোল্লাসময় প্রতিজ্ঞায় বাস্তবিকই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সামগ্রিকভাবেই সারা পৃথিবীতে এই পারমার্থিক শাস্ত্রসম্ভারের ভিত্তি অবলম্বন করেই ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে চলেছে। *স্বাধ্যায়ম্* বলতে ধর্মশাস্ত্রাদির কল্পিত কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা বোঝায় না, তা ছাড়া নিজেকে বিদ্বান বলে জাহির করবার ব্যর্থ মানসিকতা নিয়ে অনেক গ্রন্থাদি পাঠ করবার চেষ্টা করাও অনুচিত। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে যেভাবে প্রতিপন্ন করেছেন, সেই ভাবেই এই পারমার্থিক শাস্ত্রসম্ভার অনুশীলন করা উচিত, যার ফলে যথার্থ পারমার্থিক প্রগতির মাধ্যমে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বাস্তব অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে।

আর্জবম্ শব্দটি সরলতা অর্থাৎ ঋজুতাপূর্ণ মনোভাব বোঝায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *স্বচ্ছতাম্*, অর্থাৎ 'পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি' বাস্তবিকই ঋজুতাপূর্ণ মনোভাবেরই নামান্তর। যার চেতনা শুদ্ধ নয়, সে নানা ধরনের কুটিল পন্থারই আশ্রয় নেয়। ঋজু মনোভাব বলতে এমন বোঝায় না যে, সততার নামে অন্যদের অপদস্ত করতে হবে, বরং বিনয় সহকারে সত্য কথাটি বলাই উচিত। *ব্রহ্মচর্যম্*, অর্থাৎ 'নিষ্কলঙ্ক জীবন' বলতে বোঝায় যে, সম্পূর্ণভাবে নারীসঙ্গ পরিহার অথবা বৈদিক প্রথামতো কঠোরভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন, যার মাধ্যমে সচ্চরিত্র সন্তানাদির সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই মৈথুনাচরণের জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায়। *অহিংসাম্* বোঝায় যে, কোনও জীবের প্রতি মানুষ হিংসাত্মক কাজ করবে না। যদি মানুষ কর্মফলের সূক্ষ্ম বিধিনিয়মাদি সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তা হলে সে জানতে পারে না যে, কর্মফলের পরিণামেই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে, সুতরাং অহিংসার চর্চা

অর্থাৎ জীবের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ-আঘাত থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস সে করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, পার্থিব জগতটা হিংসা-বিদ্বেষেই পরিপূর্ণ, এবং প্রকৃতির নিয়মবিধি অনুসারে প্রত্যেক জীবকেই যে ভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির প্রকোপে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, তাই স্বভাবতই তারা বাঁচবার তাগিদে সদাসর্বদা হিংসা-বিদ্বেষে জীর্ণ হয়েই থাকে। তাই যদি কোনও ভাবে মানুষ কাউকে শ্রীকৃষ্ণভাবনায় আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাকে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে হিংসায় জরাজীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে পারে, তা হলে সেটাই যথার্থ অহিংসার নিদর্শন রূপে বিবেচিত হয়।

সমত্বংদ্বন্দ্বসংজ্ঞয়ো বলতে বোঝায় যে, পার্থিব দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভয়াবহ আধিক্যতা হলে তখন মানুষকে স্থির মস্তিষ্কে সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলেছেন,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।"

শ্লোক ২৫

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং ।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র—সকল জায়গায়; **আত্ম**—নিজের যথার্থ সত্তা; **ঈশ্বর**—এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য; **অন্বীক্ষাম্**—সদাসর্বদা চিন্তা-নিরীক্ষার মাধ্যমে; **কৈবল্যম্**—নির্জন বাস; **অনিকেততাম্**—কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন; **বিবিক্ত-চীর**—জনশূন্য স্থানে পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রখণ্ড; **বসনম্**—বসন পরিধান করে; **সন্তোষম্**—সন্তুষ্টি; **যেন-কেনচিৎ**—যে কোনও বিষয়ে।

অনুবাদ

নিজেকে নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট চিন্ময় অত্মারূপে বিবেচনা করে সর্বদা চিন্তার মাধ্যমে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ববিষয়ের অবিসম্বাদিত নিয়ন্তারূপে স্বীকার করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানচর্চা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, নির্জন

স্থানে বসবাস করা উচিত এবং নিজগৃহ তথা গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্মে অনাবশ্যক আসক্তি বর্জন করতে হবে। অনিত্য অস্থায়ী পার্থিব শরীরটিকে সাজপোশাকে ভূষিত করা পরিত্যাগ করে, মানুষের উচিত জনশূন্য স্থান থেকে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড এনে তাই দিয়েই নিজের শরীর আচ্ছাদন করা কিংবা গাছের ছাল দিয়ে দেহ আবৃত রাখা। এইভাবেই যে কোনও পার্থিব অবস্থার মাঝে সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা লাভ করা মানুষের উচিত।

তাৎপর্য

কৈবল্যম্, অর্থাৎ নির্জন স্থানে বসবাস, বলতে বোঝায় জাগতিক নানা উৎপাত থেকে মুক্ত জায়গায় বাস করা। অতএব, বৈষ্ণব সঙ্গ যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশ একমাত্র সর্বজন স্বীকৃত লক্ষ্য, সেখানেই মানুষের থাকা উচিত। বিশেষত কলিযুগে যদি কেউ অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তা হলে তার ফলে সামাজিক অবনতি কিংবা উন্মাদের মানসিকতাই জাগবে। *অনিকেততাম্* শব্দটির অর্থ এই যে, নিজের 'মধুময় গৃহকোণ' নিয়ে একান্তই অনিত্য সন্তোষ লাভ করা কোনও মানুষেরই উচিত নয়, কারণ ঐ ধরনের সুখী গৃহকোণ বলতে মানুষকে যা সমাজে বোঝানো হয়ে থাকে, তা মানুষেরই কৃতকর্মের ফলে সৃষ্ট অভূতপূর্ব পরিস্থিতির ফলে যে কোন মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। এখনকার যুগে বাস্তবিকই কারও পক্ষে আধুনিক শহরের মধ্যে গাছের ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি করে পরিধান করা অসম্ভব, তা ছাড়া শুধুমাত্র পরিত্যক্ত কাপড়ের টুকরো দিয়ে শরীর ঢেকে রাখাও সম্ভব নয়। পুরাকালে, মানব সংস্কৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে এই ধরনের তপস্যা অনুশীলন অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতির স্বার্থে কৃচ্ছ্রতা সাধনের অবকাশ ছিল। এখনকার যুগে, অবশ্য সমগ্র মানব সমাজে *ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রচার করাই সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে। তাই, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, বৈষ্ণবেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত বস্ত্র ধারণ করে সুন্দর ভাবে শরীর আবৃত করে এমন ভাবে বদ্ধ জীবগণের কাছে উপস্থিত হবেন, যাতে বদ্ধ জীব কেউ বৈষ্ণবদের কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত কিংবা বিরক্ত হয়ে উঠবে না। কলিযুগে বদ্ধ জীব মাত্রেই জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে, এবং তাই চরম নিরাসক্তি তথা কৃচ্ছ্রতা সাধন কারও পছন্দ হয়না, বরং তার পরিবর্তে দেহসুখের ভয়াবহ নিষেধাজ্ঞা বলে তা প্রতিভাত হয়। অবশ্য, জীবনে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে হলে নিরাসক্তি তথা কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন আছে, তবে সার্বিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারকল্পে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা হল এই যে,

মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আকৃষ্ট করার জন্যই সকল প্রকার জাগতিক বস্তুই কাজে লাগাতে হবে। অতএব, কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের মহান নীতি সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবদের সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে। যেভাবেই হোক, মানুষকে যে কোনও জাগতিক পরিস্থিতির মাঝেই সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষালাভ করতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তটিতে প্রস্তুত থাকা যায়। *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশ অনুসারে, মৃত্যুর মুহূর্তটিতে আমরা যে বিশেষ চেতনার সৃষ্টি করে থাকি, সেটাই আমাদের ভবিষ্যতে পরিবেশে বহন করে নিয়ে যাবে। অতএব, মৃত্যুর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরম তত্ত্বের প্রতি মানুষের মন সার্থকভাবে নিবদ্ধ করার জন্যই এক ধরনের অনুশীলনের মতোই মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ২৬

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কর্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধাম্—বিশ্বাস; **ভাগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত; **শাস্ত্রে**—শাস্ত্রাদিতে; **অনিন্দাম্**—নিন্দা না করে; **অন্যত্র**—অন্যেরা; **চ**—ও; **অপি হি**—অবশ্যই; **মনঃ**—মনের; **বাক্**—বাক্য; **কর্ম**—এবং মানুষের কাজকর্ম; **দণ্ডম্**—কঠোর নিয়ন্ত্রণ; **চ**—এবং; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **শম**—মনের আত্মনিয়ন্ত্রণ; **দমৌ**—এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়াদির; **অপি**—ও।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহিমা-বর্ণনা যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেইগুলি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনে সকল সার্থকতা অর্জন করা যাবে, সেই বিষয়ে গভীর বিশ্বাস মানুষের থাকা উচিত। সেই সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রাদির নিন্দামন্দ পরিহার করতেও হবে। মানুষকে তার সকল কাজকর্মই কায়মনোবাক্যে সংযত করতে হবে, সদা সত্য কথা বলতে হবে এবং দেহ ও মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধা সম্পর্কে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে (মধ্য ২২/৬২) নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> 'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
> কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

"শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক প্রেমময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে মানুষ অবলীলাক্রমে অন্য সকল প্রকার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মাদি অনায়াসে সুসম্পন্ন করতে পারে। এই গভীর বিশ্বাস, সুদৃঢ় মনোভাবে যা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের অনুকূল হয়, তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা।" অতএব ভগবদ্ভক্তের মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, *ভাগবত* শাস্ত্রাদির যে সকল অনুশাসনাদি নিতান্ত পরোক্ষভাবেই নয়, যথার্থ প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিসেবা নিবেদনের প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করেছে, সেইগুলি যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ অনায়াসে জীবনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান এবং সার্থকতা অর্জন করতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *মনোবাক্কায়দণ্ডম্*, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় *মানসবাচিককায়িকবিকর্মরাহিত্যম্*— অর্থাৎ, মানুষকে কায়মনোবাক্যে তার জীবনে সকলপ্রকার পাপময় ক্রিয়াকর্ম বর্জন করতেই হবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও একাধিকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয় সংযম বলতে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করে দেওয়া বোঝায় না যার ফলে শরীর মৃতপ্রায় হয়ে যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের সেবায় মানুষ তার মানসিক, দৈহিক এবং বাচনিক ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত রাখবে, সেটাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মনা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপি অবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের মাঝেও কর্মব্যস্ত থাকে, সে নানা প্রকার জাগতিক কাজকর্ম বলতে যা বোঝায়, সেইগুলির মাঝে ব্যস্ত থাকলেও, তাকে মুক্ত পুরুষ বলতেই হয়।" (*ভক্তিরসামৃত সিন্ধু* ১/২/১৮৭) এইভাবে মানুষ তার সকল ইন্দ্রিয়াদি কায়মনোবাক্যে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত রাখলে সে *বিকর্মরাহিত্যম্*, অর্থাৎ অননুমোদিত পাপময় ক্রিয়াকর্ম সাধনের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শুধুমাত্র যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ বিকর্মরহিত অর্থাৎ পাপকর্মাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন, তাঁরাই জড়জাগতিক প্রকৃতির মায়াময় দ্বৈত সত্ত্বার ছলনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন (*সমত্বং দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োঃ*)। এই বিষয়ে শ্রীভগবান বলেছেন,

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৮) এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "যাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য, এই শ্লোকে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা পাপী, নাস্তিক, অজ্ঞ এবং প্রবঞ্চক, তাদের পক্ষে ইচ্ছা ও দ্বেষের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যাঁরা ধার্মিক, যাঁরা পুণ্য-কর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন তাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যানে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হতে পারেন। এটাই আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি মানুষকে মোহমুক্ত করতে পারেন, তাঁর সঙ্গ লাভ করার ফলে কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।"

শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ বিবৃতিটি *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "*শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুণমহিমা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল গ্রন্থে মানুষের অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। বৈষ্ণব তন্ত্রসম্ভার, মূল *বেদ* গ্রন্থাবলী, এবং *মহাভারত* যাতে *ভগবদ্গীতা* অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যাকে পঞ্চম বেদ রূপে গণ্য করা হয়েছে, সেইগুলির প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণুর নিশ্বাস থেকেই বৈদিক জ্ঞান মূলত উৎসারিত হয়েছে, এবং শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের উদ্যোগেই বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সাহিত্য রূপ বিরচিত হয়েছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুকেই এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রাদির স্বরূপসম্বন্ধ প্রবক্তা রূপে গণ্য করা উচিত।

কলাবিদ্যা নামে অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রাদিও রয়েছে, যেগুলিতে জাগতিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-বিষয়াদি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী আছে। যেহেতু ঐ ধরনের সকল বৈদিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-বিষয়াদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকেশবের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশেই বিরচিত, তাই—সন্ন্যাস জীবনে প্রবিষ্ট সাধুপুরুষগণ অবশ্যই এই ধরনের আপাত গ্রাহ্য জাগতিক শাস্ত্রসম্ভারগুলিকে কখনও নিন্দামন্দ করবেন না; কারণ এই সমস্ত সাহিত্যসম্পদ পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথেই সম্পৃক্ত, তাই এই সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শাস্ত্রাদির অবমাননার ফলে নরকগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রদ্ধা বলতে একাগ্র আন্তরিক মানসিকতা বোঝায়, যা দুই শ্রেণীতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাস এক সুদৃঢ় উপলব্ধি যে, বহুবিধ

শাস্ত্রসম্ভারের বিবৃতিগুলি সত্য। অন্যভাবে বলা চলে বৈদিক জ্ঞান সাধারণভাবে অভ্রান্ত, এই উপলব্ধিকে বলা হয় *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ গভীর বিশ্বাস। দ্বিতীয় ধরনের বিশ্বাস এই যে, জীবনে কোনও মানুষ তার লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হলে বৈদিক শাস্ত্রের বিশেষ কোনও অনুশাসন অবশ্যই তাকে পালন করে চলতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত তাই প্রথম ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন বিভিন্ন ধরনের কলাবিদ্যা তথা বৈদিক জাগতিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চার অনুকূলে, কিন্তু তাঁর আপন জীবনের লক্ষ্য পূরণে ঐ ধরনের শাস্ত্রাদি অবশ্যই স্বীকার করবেন না। তা ছাড়া *পঞ্চরাত্র* প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনাদির বিরুদ্ধাচারী কোনও বৈদিক অনুশাসনও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অনুচিত।

"সুতরাং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের বর্ণনামূলক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারই বিশ্বাসভরে স্বীকার করা উচিত এবং তার কোনও অংশেরই নিন্দামন্দ করা অনুচিত। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মার পক্ষেও, তথা অন্যান্য প্রাণীকুল, নগণ্য চলৎশক্তিহীন জীব যথা, বৃক্ষাদি, প্রস্তরাদির পক্ষেও কোনও বৈদিক শাস্ত্রের অবমাননা করা হলে, তার পরিণামে তাকে অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার রাজ্যে নিমজ্জিত হতে হয়। তাই, সুরগণ, যথা-দেবতাগণ, মহর্ষিগণ এবং ভগবদ্ভক্তগণ—সকলেরই বোঝা উচিত যে, পঞ্চরাত্রিক শাস্ত্রসম্ভার, তথা *চতুর্বেদ*, মূল *রামায়ণ*, *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য *পুরাণ* গ্রন্থাদি এবং *মহাভারত*, সবই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই পরম মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী রচনা এবং এই গ্রন্থগুলি সবই ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর অনবদ্য অপ্রাকৃত চিন্ময় মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে আর তাঁদের পারমার্থিক উন্নতির বিন্যাস অনুযায়ী বর্ণনা করে থাকে। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অন্য কোনও প্রকার ভাবধারাকে নিতান্ত মায়াময় চিন্তার প্রতিফলন মনে করতে হবে। সমস্ত প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থাদির চরম লক্ষ্য যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সর্বকিছু ও সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, এবং ভগবদ্ভক্ত যে শ্রীভগবানের মর্যাদার থেকে ভিন্ন নন, তা প্রতিপন্ন করা, তবে ঐ ধরনের ভগবদ্ভক্তদের অবশ্যই তাঁদের পারমার্থিক অগ্রগতির স্তর অনুসারে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যো/বেদান্তকৃদ্ বেদবিদ্ এব চাহম্*—"সমস্ত বেদের মাধ্যমে আমাকে জানতে হবে; যদিও, আমিই বেদান্তের সঙ্কলক, এবং আমিই বেদগ্রন্থের সর্বজ্ঞ।" (*গীতা* ১৫/১৫) তেমনই, শ্রীভগবান বলেছেন—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

"যেহেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল সবকিছুরই ঊর্ধ্বে অবস্থান করি এবং আমি অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়হীন সবকিছু থেকেও উত্তম, তাই ইহলোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।" (*গীতা* ১৫/১৮)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে যে সকল ঐশ্বরিক গুণাবলী বিকাশের কথা বলা হয়েছে, কোনও যথার্থ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ না করলে তা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।* এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত ভাবধারা উল্লেখ করেছেন—

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

"যেজন ভগবান শ্রীগোবিন্দের আরাধনা করে, কিন্তু তাঁর ভক্তদের বন্দনায় ব্যর্থ হয়, তাকে ভগবদ্ভক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না, বরং তাকে নিতান্তই মিথ্যা অহঙ্কারের দাস বলা চলে।" শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তের চরণকমলে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে স্বয়ং শ্রীভগবানের পূজা-অর্চনাদি সুসম্পন্ন করা বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে উঠে।

এই ধরনের আত্মসম্পর্কিত জীবাত্মার পক্ষে কোনও প্রকার কৃত্রিম কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর '*নারদ পঞ্চরাত্র*' থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর বহির যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

"যদি কেউ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে, তবে তার পক্ষে বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত করবার কী প্রয়োজন আছে? আর যদি কেউ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে না, তা হলে কোনও রকম প্রায়শ্চিত্তই তাকে রক্ষা করতে পারে না। যদি কেউ উপলব্ধি করে যে, ভগবান শ্রীহরি অন্তরে ও বাহিরে সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কী দরকার আছে? আর যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে না যে, শ্রীহরি সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তবে তার সকল প্রায়শ্চিত্ত সাধনই বৃথা।" যে কোনও বৈষ্ণবজন সদা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে মগ্ন থাকেন। যদি কোনও ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার সেবা নিবেদনের

কথা চিন্তা না করে শুধুই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আর কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে বৃথা গর্বোদ্ধত হয়ে উঠে এবং নানাভাবে জাগতিক সামগ্রী গ্রহণ আর বর্জন করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তাকে ঐ সব কৃচ্ছ্রতা সাধনের নামে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধাবিপত্তিরই সম্মুখীন হতে হয়।

যারা শ্রীভগবানের ভক্তিমূলক সেবা কর্মের বিরোধিতা করে, তাদের বাগাড়ম্বরে কোনও ভগবদ্ভক্তেরই বিচলিত বোধ করা অনুচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ়তার সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের একমাত্র উপায়। অতএব বৈষ্ণবগণ অবশ্যই *মৌনম্*, অর্থাৎ নীরবতা অভ্যাস করবেন, বৃথা তর্কবিতর্কে পরিপূর্ণ শাস্ত্রাদি বর্জন করবেন, এবং ধর্মজীবন যাপনের নামে মায়াবাদী ভাবধারার যে সকল শাস্ত্রাদি ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থতায় প্রশ্রয় দেয়, সেইগুলি পরিহার করবেন। যদি কেউ আত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন না করার ফলে অনিত্য পার্থিব দুঃখদুর্দশায় নিদারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, কিংবা যদি কেউ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে বিভ্রান্ত হয়ে পার্থিব মানুষদের এবং পার্থিব ভাবধারার আশ্রয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে তার ভক্তিমার্গের প্রগতি অচিরেই প্রতিহত হবে! তেমনই, যদি কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে বিভিন্ন সামগ্রীর প্রতি প্রেমাসক্তি প্রকাশ করে কিংবা ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়া বা *ভগবদ্গীতার* দর্শন সম্পর্কে ত্রুটি প্রদর্শন করতে প্রয়াসী হয়, যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ হতে ভিন্ন সকল বিষয়াদি নিয়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে তার নিজের মনোনিবেশের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে পারমার্থিক আত্মবিকাশের প্রগতির পথে তাকে বিষমভাবে বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ঐ ধরনের মায়াভ্রান্ত ভাবধারাকে বলা হয় *দ্বিতীয়াভিনিবেশ*, অর্থাৎ মায়ামোহের মাঝে মনোনিবেশ। অন্য দিকে, যদি কেউ বৈষ্ণবপরম্পরা নামে অভিহিত আত্মসচেতন মানুষদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈদিক শব্দসম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরমোৎসাহে কৃষ্ণনামকীর্তন তথা শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনে আত্মনিয়োজিত হন, তা হলে তাঁর মৌনতা অবলম্বন ও অনুশীলন যথার্থ সার্থকতা অর্জন করে।

ভগবদ্ভক্তি বহির্ভূত যথেচ্ছ বাক্যালাপ অর্থাৎ প্রজল্প পরিহার করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ ছাড়া শুধুমাত্র কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়াদি দমনের প্রচেষ্টায় পারমার্থিক সার্থকতা অর্জন করতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, খেতখামারে গৃহপালিত অনেক পশুকে পরস্পরের কাছে পৃথকভাবে রেখে যদিও ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করা হয়ে থাকে, তা হলেও ঐ সমস্ত পশুদের

ব্রহ্মচারী বা পারমার্থিক শিক্ষার্থী বলা চলে না। তেমনই, শুধুমাত্র শুষ্ক মনকল্পিত তর্কবিতর্ক কিংবা তাৎক্ষণিক সংযম অভ্যাসের মাধ্যমে কাউকে পারমার্থিক সাধনায় সার্থক বলা যায় না। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* যে ভাবে বৈদিক ভাবসম্পদের সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন, মনোনিবেশ সহকারে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শুধুমাত্র তাই অবশ্য শ্রবণ করা উচিত। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ।*

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বৌদ্ধ এবং জৈনদের মতো ভগবদ্-তত্ত্ববিহীন ন্যায়দর্শনাদির প্রতি যারা আকৃষ্ট হয়, অহিংসার জাগতিক নীতির মাহাত্ম্য প্রচার করে থাকে, তাদের ভগবদ্‌বিহীন ন্যায়তত্ত্বের প্রতি জাগতিক বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক উন্নতির পথে আত্মঘাতী হয়ে উঠে। কৃত্রিম কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত করা এবং জনগণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে বিশাল সামাজিক আয়োজন করা সবই কৃত্রিম উপায়ে মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার প্রচেষ্টা মাত্র, যার ফলে সমাজের যথার্থ প্রভু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের নিত্য সম্পর্ক-সম্বন্ধ আবৃত হয়েই থাকে। নীতিবাদী দার্শনিকরূপে পরিচিত ঐ সব মানুষ যখন মানব জীবনের সুযোগ নষ্ট করে ফেলে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্যসম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের অবকাশ হারায়, তখন বাস্তবিকই জনকল্যাণের নামে ঐ সব নির্বোধ মানুষগুলি মানব সমাজের প্রতি সর্বাধিক হিংসাত্মক অপরাধ করে থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার ।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

"যদি তোমরা তত্ত্বকথা এবং তর্কবিতর্কে আগ্রহ বোধ করে থাকো, তা হলে অনুগ্রহ করে তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবিচারে প্রয়োগ কর। যদি তোমরা তা কর, তোমরা তা হলে লক্ষ্য করবে সেই কৃপা কত চমৎকার।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি* ৮/১৫)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *মহাভাগবত* অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁকেই বলা চলে, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জাগতিক এবং চিন্ময় জগতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ থেকে অভিন্ন রূপে দর্শন করে থাকেন, যেহেতু সব কিছুই তাঁর মহাশক্তিরই অভিপ্রকাশ মাত্র, তবে *মহাভাগবত* মাত্রেই আরও অনুধাবন করেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিত্যকালই তাঁর সর্বাকর্ষক রূপের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা অপরূপ করে রাখেন। এইভাবেই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই

অনিকেতন অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনও বাস নিকেতনের অধিকারী হন না, অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল কোনও শরীরকেই তাঁর নিত্য আবাস রূপে স্বীকার করেন না। যেহেতু মানুষের ঘরবাড়ি এবং পরিবার-পরিজন বলতে যা বোঝায়, তা সবই তার শরীরেরই ব্যাপ্তি মাত্র, তাই ঐ ধরনের পার্থিব সৃষ্টিগুলিকেও কারও যথার্থ আবাস রূপে গণ্য করা চলে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করম্ পতিতং
মাম্ বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে কৃষ্ণ, নন্দরাজপুত্র, আমি তোমার নিত্য সেবক, তবুও আমি যে কোনও প্রকারে জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে পতিত হয়েছি। কৃপা করে তুমি আমাকে এই মৃত্যুর সাগর থেকে উদ্ধার কর এবং তোমার পাদপদ্মে একটি ধূলিকণার মতো ধারণ কর।" (*শিক্ষাষ্টক* ৫)

এইভাবেই ভক্তের উপলব্ধি করা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলের ধূলিকণার মধ্যেই তার নিত্য আবাস চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। সত্ত্বগুণের আধারে বনে-উপবনে বসবাসের মাধ্যমে, রজোগুণের আধারে শহরে-নগরে বাস করার মাধ্যমে, কিংবা তমোগুণের আধারে জুয়ানেশার কেন্দ্রে গিয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের মনোবাঞ্ছা পূরণ বৈষ্ণবমাত্রেরই পরিহার করা উচিত। সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনই কোনও জাগতিক স্থানকে তাঁর প্রকৃত বাসস্থান বলে বিবেচনা করেন না। এই বিষয়ে যাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছে, তিনি সন্ন্যাস জীবন যাপনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করতেও পারেন।

নির্বিশেষবাদী নিরাকার ধর্মী মানুষ কখনই উপলব্ধি করতে পারে না ভগবদ্ভক্ত কিভাবে নিজেকে শ্রীভগবানের সত্ত্বা থেকে নিত্যকালের মতো ভিন্ন রূপে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, সমগ্র সৃষ্টিকে শ্রীভগবান হতে অভিন্ন রূপে দর্শন করতে পারে। জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে যারা জ্ঞান আহরণ করতে সচেষ্ট হয়, এবং তাদের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বোঝাতে চেষ্টা করে, তারা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের অপ্রাকৃত চিন্ময় সত্যতা অনুধাবন করতেই পারে না, কারণ ঐ তত্ত্বটির মাধ্যমেই পরম তত্ত্বের সাথে তাঁর সৃষ্টি রহস্যের একই সাথে একাত্মতা এবং বিভিন্নতা বোঝানো হয়ে থাকে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত* দিয়ে শুরু

এই শ্লোকাদির মাধ্যমে এই সমন্বয়সূচক পারমার্থিক জ্ঞানের অবতারণা করা হয়েছে। এই শ্লোকটির মাধ্যমে মানুষকে সদ্‌গুরু গ্রহণের এবং তাঁকে সেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সকল নির্দেশাবলীর সারমর্ম এই যে, মানুষকে মায়াবাদী নিরাকার-নির্বিশেষ ঈশ্বর-তত্ত্ব বর্জন করে, রীতিনীতিবহুল ফলাশ্রয়ী কর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, এবং জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে যারা চরম উদাসীন তাদের পরিহার করে, তার পরিবর্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভগবানের অনুগামীদের সঙ্গলাভে উদ্যোগী না হয়ে নিজেকেই মহান ভগবদ্ভক্ত মনে করে থাকতে পারে যে কোনও গর্বোস্ফীত অধম ভক্ত, কিন্তু যথার্থ ভগবদ্ভক্ত জনের সঙ্গলাভ না করতে পারলে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রণী হওয়া সম্ভব হয় না।

শ্লোক ২৭-২৮

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ২৭ ॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রবণম্—শ্রবণ করা; **কীর্তনম্**—কীর্তন করা; **ধ্যানম্**—এবং ধ্যান করা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর ক্রিয়াকর্ম আশ্চর্যজনক; **জন্ম**—তাঁর আবির্ভাবের; **কর্ম**—লীলা বিস্তারের; **গুণানাম্**—অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণাবলী; **চ**—এবং; **তৎ-অর্থে**—তাঁর প্রীত্যর্থে; **অখিল**—সমস্ত; **চেষ্টিতম্**—প্রচেষ্টাদি; **ইষ্টম্**—মানুষ যেভাবেই পূজা-অর্চনা নিবেদন করে; **দত্তম্**—যে কোনও দান; **তপঃ**—প্রায়শ্চিত্ত; **জপ্তম্**—যে কোনও মন্ত্র যা মানুষ উচ্চারণ করে; **বৃত্তম্**—পুণ্যকর্মাদি সাধন; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—নিজের প্রতি; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **দারান্**—পত্নী; **সুতান্**—পুত্রাদি; **গৃহান্**—বাসগৃহ ইত্যাদি; **প্রাণান্**—জীবনদায়ী প্রাণবায়ু; **যৎ**—যা; **পরস্মৈ**—পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে; **নিবেদনম্**—নিবেদন করে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের পরমাশ্চর্য চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলাবিস্তার সম্পর্কিত কাহিনী সকলেরই শোনা, কীর্তন করা এবং ধ্যান চিন্তা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আবির্ভাব, লীলাবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, গুণবৈশিষ্ট্যাদি এবং দিব্য পবিত্র নাম মহিমার আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। সেইভাবে অনুপ্রেরণা লাভ

করবার মাধ্যমে, মানুষ তার দৈনন্দিন সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ সকল প্রকার পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ এবং ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত সবই নিবেদন করবে। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই শুধুমাত্র মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করবে। আর মানুষের সমস্ত ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সাধন করবে। মানুষ যা কিছু সুখকর কিংবা উপভোগ্য মনে করবে, তা অবশ্যই অনতিবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করবে, এবং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ এবং প্রাণবায়ুও সমর্পণ করে চলবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র), তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর, এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"এইভাবেই, প্রতিটি মানুষেরই জীবন এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে কোনও অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ এবং আত্মা উভয়কেই একই সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সকলকেই কর্তব্যকর্ম করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে নির্দেশ দিয়েছেন— সমস্ত কর্তব্যকর্ম যেন কেবল তাঁরই জন্য করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়, তাই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনে চলা উচিত, তাই শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, 'এই সব কিছুই আমাকে অর্পণ কর', এবং একেই বলা হয় 'অর্চনা'। কিছু না কিছু দান করবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'আমাকে দান কর'। এবং এর অর্থ এই যে, সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আজকাল ধ্যানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিরুচি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, যা এই যুগে বাস্তবসম্মত নয়, কিন্তু যে মানুষ জপ মালায় 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করতে করতে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পরম যোগী, সেকথা *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।"

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বহু মানুষ তাঁদের বিগত জাগতিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সঞ্চিত পার্থিব সম্পদ-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা বা কীর্তিযশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভ্রান্ত বোধ করতেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই দুটি শ্লোকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কোনও মানুষের পূর্বকর্মের মাধ্যমে ঐ ধরনের সঞ্চিত সমস্ত জাগতিক সম্পদই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধা রূপে উৎসর্গ করাই বাঞ্ছনীয়। মানুষের যশ প্রতিপত্তি, শিক্ষাদীক্ষা, ধনসম্পত্তি এবং সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই উপযোগ করা উচিত। কখনও-বা ঈর্ষাজর্জরিত জড়বাদী মানুষেরা প্রশ্ন তোলে—মানুষের কষ্টার্জিত ধনসম্পদ আর শিক্ষাদীক্ষা কেন ঐভাবে ভগবানের সেবায় অপচয় করতে যাবে—ওগুলি তো বরং অনিত্য অস্থায়ী জাগতিক শরীরের তৃপ্তি বিধানের কাজে লাগালেই বহুজনের উপকার হবে। প্রকৃতপক্ষে, যেভাবেই যা কিছু আমরা পেয়ে থাকি, এমনকি এই শরীরটিও, সবই শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, কারণ তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। অতএব, শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের মনোভাব নিয়ে মানুষ তার ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্পদ ভগবদ্ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ একাত্ম করে দিতে পারলে অবশ্যই আশীর্বাদধন্য হতে পারেন। নতুবা, *ভগবদ্গীতায়* যেমন বলা হয়েছে—*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—পরমেশ্বর ভগবান মৃত্যুরূপে স্বয়ং আমাদের জীবনে শেষ মুহূর্তে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে ভয়াবহরূপে আমাদের সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়েই যাবেন। সুতরাং, আমরা জীবিত থাকার সময়েই ঐ সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি শান্তিপূর্ণভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করাই কর্তব্য যাতে ঐভাবে সব কিছু উৎসর্গের মাধ্যমে লব্ধ পুণ্যকর্মের সুফল আমরা ভোগ করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *তপঃ* অর্থাৎ কৃচ্ছ্রতা সাধন বলতে বোঝায় যে, মানুষকে একাদশীব্রত সাধনের মতো প্রতিজ্ঞা পালন করা অভ্যাস করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রতি মাসে দু'বার শস্যাদি আহার থেকে নিবৃত্ত হয়ে উপবাস করা উচিত। এই শ্লোকে *জপ্তম্* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম, যথা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ করা সকলেরই উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও নির্দেশ করেছেন যে মানুষ মাত্রেই তার নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এবং ঘরবাড়ি সবই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তার সমগ্র পরিবারবর্গটিকেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দ করে তুলতে পারে। বংশগত মান-**মর্যাদা** বলতে যা বোঝায়, ঐসব কৃত্রিম ভাবধারায় গর্ববোধ না করে,

মানুষ মাত্রেরই সমগ্র পরিবারবর্গকে এমনভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক মাত্র। আর যখন সমগ্র পরিবারবর্গ শ্রীভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়ে যায়, তখন এক অতি চমৎকার সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ যদি *ভাগবত-ধর্ম* অনুশীলনের পদ্ধতি সম্পর্কে দীক্ষিত বা অনুপ্রাণিত না হয়ে উঠতে পারে, তা হলে তাকে অবশ্যই স্থূল জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে লব্ধ অনিশ্চিত অনির্ভরযোগ্য নানা তথ্যজ্ঞানের উপরেই ভরসা করে চলতে হবে। শ্রীভগবানের *নিত্য আবির্ভাব*, লীলাবৈভব এবং অসংখ্য দিব্য গুণাবলীর অবর্ণনীয় মনোহর বর্ণনাদির প্রতি মনোযোগী না হয়ে, অবিশ্বাসী জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষ পার্থিব সুখ-আহ্লাদ উপভোগের স্তরেই বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র সম্ভারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার সারবত্তা যদি কোনও মানুষ বুঝতে পারে, তাহলে তার ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা স্বীকার করা উচিত, কিংবা অন্ততপক্ষে কায়মনোবাক্যে তার পক্ষে সংযমী জীবন যাপন করা উচিত হবে এবং সেইভাবেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দৃঢ়চিত্ত অবলম্বন করতে পারবে। তখন তার সমস্ত বাসনা, তার সমস্ত দানধ্যান, এবং তার ব্রতসাধন আর মন্ত্রোচ্চারণ—ভাষান্তরে বলা চলে, তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার ঘরবাড়ি, তার সন্তানাদি, তার স্ত্রী এবং তার প্রাণবায়ুটুকুও—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্তরের একান্ত নিবেদিত উৎসর্গ হয়ে ওঠে। যখন কোনও জীব নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের প্রামাণ্য বর্ণনাদি বিষয়ে শ্রবণ করতে থাকে এবং তার সকল কাজকর্মই শ্রীভগবানের সেবায় ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করে দেয় এবং অন্য সকল প্রকার কাজকর্ম পরিহার করে, তখন তাকে *ভাগবত-ধর্মেরই* পর্যায়ে দৃঢ়স্থিত মানুষ রূপে স্বীকার করা হয়।

শ্লোক ২৯

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্ ।
পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃষ্ণ-আত্ম-নাথেষু**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা তাদের আত্মার প্রভু রূপে স্বীকার করে; **মনুষ্যেষু**—মানুষেরা; **চ**—এবং; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **পরিচর্যাম্**—সেবা-পরিচর্যা; **চ**—এবং; **উভয়ত্র**—উভয়ের উদ্দেশ্যে (স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীবর্গের, অথবা শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের); **মহৎসু**—(বিশেষত) শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের প্রতি; **নৃষু**—নরগণের প্রতি; **সাধুষু**—যাঁরা সৎ আচরণে অভ্যস্ত।

অনুবাদ

যিনি তাঁর চরম স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিলাষী, তাঁকে অবশ্যই এমন মানুষদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে, যে সব মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের জীবনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন। তাছাড়াও মানুষকে সকল জীবের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা মানব জীবন লাভ করেছে আর তাদেরও মধ্যে যারা ধর্মাচরণের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হওয়া মানুষমাত্রেরই উচিত। ধার্মিক মানুষদের মধ্যেও বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং যাঁরা তার ফলে শ্রীভগবানের চরণকমলে শরণাগতি তথা আশ্রয় লাভ করেছেন, তাঁদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করাই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সর্বোত্তম কর্তব্য কর্ম। ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য, যেহেতু শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তদের প্রীতিসাধনে আন্তরিক সেবা নিবেদন করার ফলে শ্রীভগবান অধিক প্রীতি অনুভব করে থাকেন। শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁর ভক্তবৃন্দ এবং তাঁর পূজনীয় পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত নয়, বরং শ্রীভগবানের প্রতিভূ যাঁরা মহাভাগবত রূপে বিদিত, তাঁদের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতপক্ষে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩০

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

পরস্পর—পারস্পরিক; **অনুকথনম্**—আলোচনা; **পাবনম্**—পবিত্রতা সাধন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশঃ**—যশ; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **রতিঃ**—প্রেমাকর্ষণ; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **নিবৃত্তিঃ**—জাগতিক দুঃখ কষ্টের অবসান; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গলাভ করতে হয়, তা মানুষ মাত্রেরই শেখা উচিত। এই ধরনের

সঙ্গলাভ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে শুদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের মধ্যে প্রেমময় সখ্যতা গড়ে তুলতে থাকলে, তাঁরা পারস্পরিক সুখ এবং সন্তোষ বোধ করতে থাকেন। আর এইভাবেই পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাঁরা দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ কিংবা ঈর্ষা-দ্বেষ পোষণ করে থাকবেন না। ঐ ধরনের সকল প্রকার তুচ্ছ মনোভাব বর্জন করে, একসাথে সমবেতভাবে তাঁদের পারস্পরিক শুদ্ধিতার স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সমাগমে যখন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা হতে থাকে, তখনই তা সবিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যখন ভক্তমণ্ডলী সমবেতভাবে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তনে নিয়োজিত হন, তখন তাঁরা সর্বোচ্চ অপ্রাকৃত তথা দিব্য আনন্দ এবং তৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেইভাবেই তাঁরা জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা, যা অবৈধ নারী সংসর্গের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা থেকে নিবৃত্ত হতে পরস্পরকে যথার্থ উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। একজন ভক্ত অন্যজনকে বলবেন, "ওহে, তুমি তো ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করেছ। আজ থেকে শুরু করে, আমিও তা বর্জন করব।"

ভক্তদের প্রতি প্রেম-ভালবাসার বিকাশ সাধন, তাদের সন্তুষ্ট রাখা কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদির বর্জন করার অনুশীলন করা উচিত। আরও চর্চা করা উচিত—কিভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের সেবা পরিকর রূপে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে শেখা উচিত। ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য সকল সামগ্রী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপযোগ করার মাধ্যমেই মানুষ আপনা হতেই সেইগুলি থেকে নিস্পৃহ হয়ে যেতে থাকে। আর মানুষ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ লাভে দিনাতিপাত করতে থাকলে, ক্রমশই মানুষের দিব্য আনন্দ উদ্ভাসিত হতে থাকে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বিষয়াদি আলোচনার মাধ্যমে। অতএব, ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে মায়ার কবলে বিব্রত হওয়ার বিপদ থেকে যে রক্ষা পেতে চায়, তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তমণ্ডলী যাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ তথা পৃথিবীতে শ্রীভগবানের বাণী প্রচার ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেন না, তাঁদেরই নিত্য সঙ্গ লাভে পরম উৎসাহে উদ্যোগী হয়ে থাকতেই হবে।

শ্রীল মধ্বাচার্য নির্দেশ করেছেন যে, ভক্তদের সঙ্গে যেমন সখ্যতা গড়ে তোলা সব মানুষেরই কর্তব্য, তেমনই দেবতাগণ যাঁরা শ্রীভগবানের নির্দেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেছেন, তাঁদের প্রতিও সখ্যতার মনোভাব অনুশীলন করা উচিত। মানুষের এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস এইভাবেই অভ্যাস করা উচিত।

শ্লোক ৩১

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ৩১ ॥

স্মরন্তঃ—স্মরণের মাধ্যমে; **স্মারয়ন্তঃ চ**—এবং স্মরণ করানো; **মিথঃ**—পরস্পর; **অঘ-ওঘ-হরম্**—যিনি ভক্তের সকল অশুভ হরণ করেন; **হরিম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **সঞ্জাতয়া**—জাগরিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **বিভ্রতি**—লাভ করেন; **উৎপুলকাম্**—উল্লাস; **তনুম্**—শরীরে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তগণ সদাসর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন। এইভাবেই তাঁরা নিয়ত শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেন। এইভাবেই, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ফলে, ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে, শ্রীভগবান তাঁদের জীবন থেকে সর্বপ্রকার অশুভ বিষয়াদি হরণ করে থাকেন। সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে শুদ্ধ হয়ে, ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, এবং এই জগতের মাঝেও, তাঁদের চিন্ময় ভাবাপন্ন শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভাবোল্লাস লক্ষ্য করা যায়।

তাৎপর্য

অঘৌঘহরম্ শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। *অঘ* বলতে যা কিছু অশুভ কিংবা পাপময় বিষয়কে বোঝায়। জীবমাত্রেই বাস্তবিকই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, অর্থাৎ নিত্যস্থিত এবং আনন্দ ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ সত্ত্বা, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্য সম্বন্ধ অবহেলা করার ফলেই সে পাপকর্ম করে এবং অশুভ কর্মফল স্বরূপ জাগতিক দুঃখ ভোগ করতে থাকে। পাপময় কর্মফলের প্রতিক্রিয়াজনিত ঘটনাপ্রবাহকে বলা হয় *অঘ*, অর্থাৎ দুঃখকষ্টের অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাত। শ্রীকৃষ্ণ *অঘৌঘহরং হরিম্*—তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের পাপময় কর্মফলাদি হরণ করে নেন, যাঁর ফলে এই দুঃখময় জগতের মাঝে অবস্থান করা সত্ত্বেও ভগবদ্ধামের অচিন্ত্য আনন্দ-সুখের অভিজ্ঞতা লাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের দুটি বিভাগ আছে—সাধনভক্তি এবং রাগানুগ ভক্তি। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটিতে সাধনভক্তি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়মনিষ্ঠা পালনের পদ্ধতি থেকে রাগানুগ ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ প্রেমভক্তির অনুশীলন পর্যায়ে ভক্তের উন্নতি লাভের প্রক্রিয়া বিশদভাবে ব্যাখা করেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, মুক্তাত্মা পুরুষ সর্বদাই তাঁর শরীরে দিব্য ভাবোল্লাস সৃষ্টির ফলে পরমোৎসাহ বোধ করে থাকেন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমা কীর্তনে তিনি সদাসর্বদাই উল্লসিত হয়ে উঠতে আগ্রহ বোধ করেন।

শ্লোক ৩২

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্
ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃত্যাঃ ॥ ৩২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **রুদন্তি**—তারা ক্রন্দন করে; **অচ্যুত**—অক্ষয় অমর পরমেশ্বর ভগবান; **চিন্তয়া**—চিন্তার মাধ্যমে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **হসন্তি**—তারা হাসে; **নন্দন্তি**—গভীর আনন্দ লাভ করে; **বদন্তি**—কথা বলে; **অলৌকিকাঃ**—অলৌকিক আশ্চর্যভাবে কাজ করে; **নৃত্যন্তি**—তারা নৃত্য করে; **গায়ন্তি**—গান করে; **অনুশীলয়ন্তি**—এবং অনুকরণ করে; **অজম্**—জন্মরহিত; **ভবন্তি**—তারা হয়ে ওঠে; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **পরম্**—পরমেশ্বর; **এত্য**—লাভ করে; **নির্বৃত্যাঃ**—দুঃখভোগ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের প্রেমস্পর্শ লাভ করার ফলে, ভক্তগণ অনেক সময়ে অচ্যুত অক্ষয় ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠেন। কখনও তাঁরা হাসেন, মহোল্লাস বোধ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। ঐ ধরনের ভক্তবৃন্দ জাগতিক বদ্ধ জীবনধারার ঊর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনও-বা অচ্যুত জন্মরহিত শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। আর কখনও-বা, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে, তাঁরা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণাদি ব্যাখ্যা করেছেন। *রুদন্তি*—ভক্তগণ চিন্তা করেন এবং কাঁদেন, "আরও একটি দিন কেটে গেল, আর এখনও আমি শ্রীকৃষ্ণ লাভ করতে পারিনি। তা হলে আমি কি করব, কোথায় যাব, কার কাছে খোঁজ নেব, আর কেই-বা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর জন্যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে?" *হসন্তি*—এখন গভীর রাত, আকাশ অন্ধকার, এবং শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক বয়স্কা গোপীর ঘর থেকে চুরি করতে মনস্থ করেছেন। গো পালকদের একজনের উঠানের কোণে একটি গাছের নিচে তিনি লুকিয়ে রয়েছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ মনে করছেন যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে আছেন, তবু তিনি হঠাৎ গোপ-পরিবারের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে থেকে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। "ওখানে কে তুমি? কে তুমি? বলো।" তাই কৃষ্ণ ধরা পড়ে গেছেন, এবং তিনি উঠান থেকে পালাতে শুরু করছেন। ভক্তের কাছে যখন এই হাস্যকর দৃশ্য প্রতিভাত হল, তখন ভক্তটি মনের সুখে হাসতে শুরু করল। *নন্দন্তি*—যখন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই তাঁর দিব্যরূপ ভক্তের কাছে অভিব্যক্ত করেন, তখন ভক্ত মহা দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। *বদন্তি*—শ্রীভগবানকে ভক্ত বলতে থাকেন, "হে কৃষ্ণ, কতদিন পরে অবশেষে আমি তোমাকে পেয়েছি।"

যখন ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন ভক্ত সার্থকভাবে জীবনের জাগতিক পরিবেশ অতিক্রম করে যায়। এইভাবটি *অলৌকিকঃ* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। *অলৌকিকঃ*, অর্থাৎ দিব্য স্তর সম্পর্কে শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) ব্যাখা করেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোনও অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *অজং হরিম্ অনুশীলয়ন্তি তল্লীলাম্ অভিনয়ন্তি*—"*অনুশীলয়ন্তি* বলতে বোঝায় যে, ভাবোল্লাসের মাধ্যমে ভক্তগণ কখনও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্য অনুকরণ করতে কিংবা লীলাভিনয় করতে চেষ্টা করে থাকে।" শ্রীকৃষ্ণের বিরহ মুহূর্তে বৃন্দাবনধামের গোপীগণের আচরণে এমনই ভাবোল্লাস জনিত আচরণ লক্ষণাদি প্রকটিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই জগতে কিংবা ভোগৈশ্বর্যময় স্বর্গধামে কোনই যথার্থ সুখ নেই, এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁকে অবশ্যই পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণকমলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*। নিচের শ্লোকগুলিতে যথার্থ শিষ্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত নির্দেশাদি দেওয়া হয়েছে। এখন এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন তথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পরিণত ফললাভ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির চরণকমলের ধূলি মাথায় নিয়ে অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দলাভের এই স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ প্রত্যেকেরই রয়েছে। ঈর্ষান্বিত মনোভাব এবং মিথ্যা মান-অভিমান প্রত্যেকেরই বর্জন করা উচিত এবং বিনম্রচিত্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে শ্রীভগবানের কৃপার অবতার রূপে বিবেচনা করতে হয়। যে কোনও নিষ্ঠাবান জীব যিনি পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবা করেন, তিনি অবশ্যই জীবনে সর্বোত্তম সার্থকতা (*শ্রেয় উত্তমম্*) লাভ করেন। তিনি ভগবানের নিজধামে দিব্য আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৩

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া ।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ভাগবতান্ ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিজ্ঞান; **শিক্ষন্**—শিক্ষালাভ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **তৎ-উত্থয়া**—তার মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়ে; **নারায়ণ-পরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ভক্তিমান হয়ে; **মায়াম্**—মায়াময় শক্তি; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরতি**—অতিক্রম করে; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিশেষ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে বাস্তবিকই আত্মনিয়োগ করে, ভক্ত মাত্রেই ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হন। আর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূর্ণভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে, ভক্ত অতি অনায়াসেই দুরতিক্রম্য মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির জাল অতিক্রম করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকটিতে *মায়াং অঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্* শব্দগুলির মাধ্যমে যে মুক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ভগবৎ-

প্রেমেরই এক আনুষঙ্গিক উপাদান তথা পারম্পরিক ফলশ্রুতি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেই বলা হয়েছে—*ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং/বেদ্যং বাস্তবম্ অত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।* *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিজ্ঞান শেখানো হয়েছে যার পরম লক্ষ্য শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভ। বৈষ্ণব আচার্যবর্গের অভিমত অনুসারে, মুক্তি প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রেমেরই আনুষঙ্গিক বিষয়। *শিবদং তাপ-ত্রয়োন্মূলনম্।* *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবার তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, বিজ্ঞান কথার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তি আয়ত্ত করাই জীবনের পরম লক্ষ্য। বৈষ্ণব আচার্যবর্গের পরামর্শানুসারে, ভগবৎ-প্রেমেরই সুফল রূপে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। *শিবদং তাপ ত্রয়োন্মূলনম্।* মুক্তি অর্জনের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন জানানোর কোনই প্রয়োজন হয় না, কারণ ভগবানের অনুশাসনাদি মান্য করে চলার মাধ্যমেই আপনা হতে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। *ভগবদ্গীতার* উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* প্রত্যেক জীবকেই জীবন ধারণের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ধারণাগুলি বর্জন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র চরণাশ্রয়ে ভরসা করে চলতে হবে। মানুষ যদি শ্রীভগবানের এই আদেশ মান্য করে চলে, তা হলে অচিরেই তার জীবৎকালেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়ে যায়। ভগবৎ প্রেম থেকেই যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করা যায়, তার জন্য বিন্দুমাত্র জল্পনাকল্পনা কিংবা ফলাশ্রয়ী কর্মজীবনের বাসনার প্রয়োজন হয় না।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কোনও প্রকার জাগতিক লাভ কিংবা প্রাপ্তির অভিলাষ বর্জন করে, মনকল্পিত জ্ঞানানুশীলন না করে, অনুকূল মানসিকতা নিয়ে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক প্রেম ভক্তিময় সেবা নিবেদনের চর্চা করা উচিত। তাকেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন বলা চলে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১) অতএব এখানে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইভাবে মায়াময় দুরতিক্রমা মহাসমুদ্র অতিক্রম করাই *ভাগবত-ধর্ম* তথা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদনের অনুশীলনের উদ্দেশ্য নয়, বরং শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমেরই আনুষঙ্গিক সুফল স্বরূপ তা লব্ধ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরাজোবাচ

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নারায়ণ-অভিধানস্য**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **নিষ্ঠাম্**—অপ্রাকৃত দিব্য প্রতিষ্ঠা; **অর্হথ**—আপনি কৃপা করে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **বক্তুম্**—বলুন; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **হি**—অবশ্যই; **ব্রহ্মবিৎ-তমাঃ**—পরমেশ্বর সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—"কৃপা করে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন, যিনি পরমতত্ত্ব এবং প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা স্বরূপ। আপনারাই এই বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, কারণ এই দিব্য জ্ঞানে আপনারাই সর্বাধিক অভিজ্ঞ।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ঋষিবর্গ রাজাকে জানিয়েছিলেন—*নারায়ণপরো মায়াম্ অঞ্জস্ তরতি দুস্তরম্*—ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি শুধুমাত্র অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই মানুষ অনায়াসে জাগতিক মায়াময় সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে পারে। সুতরাং, এই শ্লোকটিতে রাজা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য জানতে চাইছেন। এই শ্লোকটির মধ্যে তাৎপর্যময় এই যে, পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীনারায়ণ, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপে রাজা উল্লেখ করেছেন। যদিও রাজা নিমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ভক্তরূপে সুবিদিত, তবু তিনি এখানে তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইছেন পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যতত্ত্ব। *ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দতে ॥

"তত্ত্ববিদ্ মানুষমাত্রেই যাঁরা পরম তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁরা এই অদ্বৈত তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবান বলে থাকেন।" সুতরাং বুঝতে হবে যে, এই শ্লোকে 'নারায়ণ' শব্দটি বলতে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বরের 'ভগবান' স্বরূপকেই বোঝানো হয়েছে।

সচরাচর কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা পরমতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক নিরাকার ব্রহ্ম বিষয়েই আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, তবে যোগীরা প্রত্যেকের অন্তরে পরমাত্মার ধ্যান চর্চা করতেই পছন্দ করেন। অন্যদিকে, যাঁরা দিব্যজ্ঞানের পরিপূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই বৈকুণ্ঠধামে নিজধামে নিত্যস্থিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকেন। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"*নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের* উৎপত্তি আমা হতেই হয়েছে।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমাত্মা ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুষঙ্গিক অংশাবতার। মহারাজ নিমি তাই ঋষিবর্গের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চেয়েছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই শুদ্ধ পরম তত্ত্ব, এবং তাই তাঁর প্রশ্নটি নব যোগেন্দ্রবর্গের পরবর্তী ঋষি পিপ্পলায়নের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমতে, *নিষ্ঠা* শব্দটিকে 'দৃঢ় বিশ্বাস' রূপেও অনুবাদ করা যেতে পারে। এই বিচারে, নিমিরাজ জানতে চেয়েছেন—কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় দৃঢ় বিশ্বাস (*ভগবান-নিষ্ঠা*) সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৫ ॥

শ্রীপিপ্পলায়নঃ উবাচ—শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি বললেন; **স্থিতি**—সৃষ্টির; **উদ্ভব**—পালনের; **প্রলয়**—এবং ধ্বংসের; **হেতুঃ**—কারণ; **অহেতুঃ**—বিনা কারণে; **অস্য**—এই পার্থিব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; **যৎ**—যাহা; **স্বপ্ন**—স্বপ্নে; **জাগর**—জাগরণে; **সুষুপ্তিষু**—গভীর ঘুমে বা অচেতনে; **সৎ**—যা বর্তমান; **বহিঃ চ**—এবং তার বাইরেও; **দেহ**—জীবের জড়জাগতিক দেহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **আসু**—প্রাণবায়ু; **হৃদয়ানি**—এবং মনের; **চরন্তি**—কাজ; **যেন**—যার দ্বারা; **সঞ্জীবিতানি**—জীবন দান; **তৎ**—তাতে; **অবেহি**—কৃপা করে জানবেন; **পরম্**—পরমেশ্বর হতে; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজা।

অনুবাদ

শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ, তা সত্ত্বেও তাঁর আনুপূর্বিক কোনও কারণ ছিল না।

তিনি জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে কালক্ষেপ করে থাকেন অথচ সেই সকল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। পরমাত্মা রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করে দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ সঞ্জীবিত করেন এবং ঐভাবেই দেহের সকল সূক্ষ্ম আর স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেগুলির কাজ শুরু করে। হে রাজা, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই পরমতত্ত্ব বলে জানবেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে নিমিরাজ পরম তত্ত্বের বিবিধ রূপাঙ্গ যথা—শ্রীনারায়ণ, ব্রহ্ম, এবং পরমাত্মা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। এখন ঋষি পিপ্পলায়ন পরম তত্ত্বের এই তিনটি রূপাঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যাতে নিমিরাজের অনুসন্ধিৎসু অনুসারেই পর পর সেগুলি তিনি বুঝতে পারেন। *স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতু* শব্দসমষ্টির দ্বারা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই ত্রয়ী পুরুষ-অবতাররূপে নিজেকে প্রকটিত করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/১) তাই বর্ণনা করা হয়েছে—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

"সৃষ্টির প্রারম্ভে, শ্রীভগবান প্রথমে পুরুষ অবতারের বিশ্বরূপে আপনাকে মহৎভাবে অভিব্যক্ত করেছিলেন এবং জড়জাগতিক সৃষ্টির উপযোগী সকল প্রকার উপাদানই উপস্থিত করেন। আর এইভাবেই প্রথমে পার্থিব ক্রিয়াকলাপের ষোড়শকলা বিষয়ক নিয়মনীতি অভিব্যক্ত হতে থাকে। জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সেটাই ছিল উদ্দেশ্য।" তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণকে এখানে *হেতুঃ*, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, স্বয়ং শ্রীভগবানের জন্য কোনই কারণের প্রয়োজন ছিল না, তিনি *অহেতুঃ।* তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।* পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার কারণেরই পরম কারণ, এবং তিনি স্বয়ং নিত্য সত্য পরম তত্ত্ব বলেই, তাঁর নিজের সত্ত্বার কোনই কারণ নেই। *অহেতুঃ* শব্দটি সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের আপনার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর নিজ দিব্যধাম কৃষ্ণলোকে বিরাজ করেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নিত্যনিয়ত তাঁর নিত্যমুক্ত পারিষদবর্গের সান্নিধ্যে আনন্দময় লীলা বিহারে সদাসর্বদাই নিয়োজিত থাকেন, তাই মায়া নামে অভিহিত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা উদ্ভূত এই জগতের সকল বিষয় থেকেই তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। তাই

বলা হয়েছে যে, *জগৃহে পৌরুষং রূপম্।* শ্রীভগবান আপনাকে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণু রূপে অভিব্যক্ত করেন যাতে বদ্ধজীবগণের পক্ষে সর্বাঙ্গীন মায়ামোহ সৃষ্টি এবং তার ক্রমান্বয়ে সংশোধনের প্রক্রিয়া সাধিত হতে পারে। জড়জাগতিক সৃষ্টি বৈভব থেকে শ্রীভগবানের নির্লিপ্ত হয়ে থাকার বিষয়ে *বেদে* বলা হয়েছে—*ন তস্য কার্যং করণং য বিদ্যতে।* পরম তত্ত্বের কিছুই করবার থাকে না, যেহেতু সব কিছুতেই তাঁর বহুবিধ শক্তিরাজির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধিত হতে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *অহেতুঃ*, অর্থাৎ স্বয়ং কারণহীন এবং জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের কারণ থেকে নির্লিপ্ত, তাই এই শ্লোকে তাঁকে *হেতুঃ* অর্থাৎ জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির আদি সঞ্চালক রূপে সক্রিয় সেই তিনিই স্বয়ং পরমাত্মা, তথা সকল আত্মার মূল উৎস রূপে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছেন।

অহেতুঃ শব্দটিকে অন্যভাবে বুঝতে পারা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) শ্রীভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

বদ্ধজীবগণ (*জীবভূত*) তাদের জড় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে (*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি-প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*) ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগে প্রবৃত্ত থাকতে অভিলাষী হয়। সেই কারণেই জড়জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। বাস্তবিকই, জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি অব্যাহত থাকে, কারণ বদ্ধ জীবগণের অভিলাষ অনুসারে তা উপভোগ করতে পারা যায় (*যয়েদং ধার্যতে জগৎ*)। যারা পাপকর্মে উৎসুক, সেই ধরনের নাগরিকদের রাখার জন্য দেশের সরকারকে অবশ্যই কারাগার সৃষ্টি করতেই হয়। কারাগারের নোংরা পরিবেশের মাঝে কোনও নাগরিকেরই থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেহেতু জনগণের একটি বিশেষ অংশ অসামাজিক আচার-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হতে চায়, তাই কারাগারের দরকার হয়ে পড়ে। উচ্চতর ভাবধারা অবলম্বনে বলা চলে যে, কারাবন্দীরা নিজেরাই কারাগার গঠনের কারণ অর্থাৎ *হেতুঃ* তা অবশ্যই মনে করা যায়। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজের এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দিব্য আনন্দ বৃদ্ধির নিজ অভিলাষেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকাশ সাধন করে থাকেন, কিন্তু তাঁকে ইচ্ছাপূর্বক বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবন যাপনে বদ্ধ জীবকুলের অসৎ অভিলাষের প্রত্যুত্তরে তিনি জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করে থাকেন। সুতরাং স্বয়ং বদ্ধ জীবকুলই জড়জাগতিক সৃষ্টির *হেতু*

অর্থাৎ কারণ, তা মনে করা যেতেই পারে। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তথা *মায়া*, যার উপরে জড়জাগতিক সৃষ্টি বিকাশের কর্তব্যভার ন্যস্ত আছে, তাকে *ছায়া* বলা হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির ছায়া। *সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা/ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।* শ্রীভগবান স্বয়ং দুর্গা অর্থাৎ মায়া নামে অভিহিতা ছায়াশক্তি রূপে অভিব্যক্ত হতে অভিলাষী নন। নিত্যকাল অভিব্যক্ত পরমানন্দময় দিব্য গ্রহলোকগুলিতে শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ জীবগণের উপযোগী সকল প্রকার সম্ভাব্য উত্তমোত্তম সুখসুবিধাই রয়েছে। কিন্তু বদ্ধজীবগণ শ্রীভগবানের করুণায় আয়োজিত সেই সকল অকল্পনীয়, নিত্য বিরাজমান জীবনযাপনের ব্যবস্থাদি পরিহার করে, জড়জাগতিক পৃথিবী নামে অভিহিত ছায়া রাজ্যের মাঝে তাদের দুর্ভাগ্যের জীবনই স্বীকার করে নেওয়ার ইচ্ছা করে থাকে। তাই, দুর্গা এবং বদ্ধ জীব কুলকে জড়জাগতিক সৃষ্টি অভিব্যক্তির কারণ বা হেতু রূপে মনে করা যেতে পারে। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর পরিণামে *সর্বকারণকারণম্*, সকল কার্যকারণের তিনিই মূল কারণ স্বরূপ, তাই তাঁকেই শেষ পর্যন্ত পরম কারণ বলা উচিত। কিন্তু শ্রীভগবান কিভাবে জাগতিক সৃষ্টির পরম কারণ স্বরূপ সক্রিয় থাকেন (*স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুঃ*), তা *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ*—শ্রীভগবান উপদ্রষ্টা ব্যবস্থাপক এবং অনুমতি প্রদানকারী রূপে সক্রিয় থাকেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যথার্থ অভিলাষ অতি সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* শ্রীভগবানের অভিলাষ, প্রত্যেক জীব ছায়া শক্তির মায়া বর্জন করে যথার্থ বিষয়ে (*বাস্তবং বস্তু*) প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ সেটাই শ্রীভগবানের নিত্যধাম।

যদিও পরমতত্ত্বের বিবিধ বিষয় নিয়ে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তবু জানতে হবে যে, পরম তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটাই আছে, যা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে (*তদ্ অবেহি পরং নরেন্দ্র*)। নিমিরাজ ব্রহ্ম বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন, এবং এখন এই শ্লোকটিকে বলা হয়েছে, *যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্ বহিশ্চ*। শ্রীভগবানের জাগরিত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে তাঁর সকল প্রকার সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য এবং এই তিনটি মানসিক পরিস্থিতিরও ঊর্ধ্বে তাঁর অধিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের অভিপ্রকাশ বলেই বুঝতে হবে, যা শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তি। অবশেষে, *দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়াণি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি* শ্লোকাংশটিকে শ্রীভগবানের পরমাত্মা স্বরূপ সম্পর্কে উল্লিখিত বিবৃতি বলে স্বীকার করতে হবে। যখন শ্রীভগবান নিজেকে শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রূপে বিকশিত

করেন, এবং প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন, তখন শরীরের প্রত্যেকটি স্থূল এবং সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, যার ফলে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ তথা কর্মবন্ধনের শৃঙ্খল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সেগুলি সজাগ হয়ে উঠে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অসংখ্য অভিপ্রকাশের ফলেও তাঁর পরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি অভিপ্রকাশের সঙ্গে দ্বিতীয়টির কোনও প্রকার সংঘাত কিংবা আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা ঘটে না। পরম তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে পরমব্যোমনাথ অর্থাৎ চিদাকাশের প্রভু, যিনি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে, কখনও-বা চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ কিংবা সহস্রভুজ রূপেও প্রকটিত হন। প্রত্যেকটি আবির্ভাবেই তিনি সচ্চিদানন্দ মূর্তি ধারণ করেন। তিনি পৃথিবীতে বাসুদেব রূপে এবং কারণ সমুদ্রে মহাবিষ্ণু রূপে বিরাজিত থাকেন। তিনি ক্ষীরসমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে শায়িত থাকেন এবং শ্রীনৃসিংহদেব রূপে তাঁর অসহায় শিশু ভক্তকে রক্ষা করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি আদর্শ নৃপতির লীলা প্রদর্শন করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি প্রত্যেকের হৃদয় হরণ করেন এবং বিশেষত তরুণী অপরূপা নারীকুলের মনোরঞ্জন করেন। শ্রীভগবানের এই সকল প্রকার বৈচিত্র্য বিকাশ অভিব্যক্ত হয় 'নারায়ণ' শব্দটি মাধ্যমে, অর্থাৎ তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে নরসমাজের মনোরঞ্জন করতে অভিলাষী হন, ঠিক যেভাবে সভাপতি বললে শুধুমাত্র সভাপতি রূপে কার্যভার পরিচালনার কথা বোঝায় না—সকলের সঙ্গে আপন পরিবারভুক্ত মানুষের মতো বহুদিনের হৃদ্যতাপূর্ণ সখ্যভাবও বোঝায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসারে, *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*। যখন মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শাস্ত্রসম্মত উপলব্ধির বাইরে এসে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে থাকে, এবং শ্রীভগবানের প্রেমসত্ত্বার পরম মর্যাদা আস্বাদন করতে পারে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের কারণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। শ্রীভগবানের অগণিত বিষ্ণু অবতারগুলিকেও শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার রূপে স্বীকার করতে হয়। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*। এই তত্ত্বগুলি সুপরিস্ফুটভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ছাড়াও প্রারম্ভিক শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদ্ ইতরশ্চার্থেষু*।

শ্লোক ৩৬

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ ।

শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলম্
অর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—পারে না; এতৎ—এই (পরম সত্য); মনঃ—মন; বিশতি—প্রবেশ করে; বাক্—বাক ক্ষমতা; উত—নতুবা; চক্ষুঃ—দৃষ্টি; আত্মা—বুদ্ধি; প্রাণ—জীবন ধারণের জন্য সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; চ—অথবা; যথা—যেভাবে; অনলম্—অগ্নি; অর্চিষঃ—স্ফুলিঙ্গ হয়; স্বাঃ—নিজের; শব্দঃ—বেদের প্রামাণ্য বাণী; অপি—এমন কি; বোধক—বাক্যের মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম; নিষেধতয়া—ঐভাবে নিষেধ করার ফলে; আত্ম—পরমাত্মা; মূলম্—প্রকৃত প্রমাণ; অর্থ-উক্তম্—অন্যভাবে কথিত; আহ—প্রকাশিত করে; যদ্-ঋতে—যার দ্বারা (পরম); ন—থাকে না; নিষেধ—শাস্ত্রের নিষেধাত্মক বাণী; সিদ্ধিঃ—চরম উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

মূল অগ্নি থেকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা সৃষ্টি হয়, তা যেমন অগ্নির উৎসরাশিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি মন, বাক্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু কিংবা কোনও ইন্দ্রিয়ই পরম তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এমনকি বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য ভাষাও পরম তত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে না, যেহেতু বেদসম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে বেদেরই ভাষার অক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক শব্দ সম্পদের পরোক্ষ প্রভাবে পরমতত্ত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেহেতু পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব ব্যতীত বেদশাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে বিবিধ অনুশাসনের কোনই চরম উদ্দেশ্য থাকত না।

তাৎপর্য

জ্বলন্ত অগ্নিরাশি থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র অগ্নিকণাগুলি মূল অগ্নিরাশিকে উজ্জ্বল করে তোলার কোনও ক্ষমতাই রাখে না, তেমনই অগ্নিকণা কখনই অগ্নিরাশিকে দগ্ধ করে ফেলতেও পারে না। মূল অগ্নিরাশির উত্তাপ এবং জ্যোতি সর্বদাই সামান্য অগ্নিকণার মধ্যেকার আগুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তেমনই, নগণ্য জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে, যা *বেদান্তসূত্রে* (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) এবং *ভগবদ্গীতায়* (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ/মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*) বলা হয়েছে। নগণ্য তুচ্ছ জীব যেহেতু *অংশ*, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, তাই তাদের শক্তির পরিমাণে কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের জ্ঞান এবং আনন্দের রাশি সর্বদাই উত্তম। সুতরাং যখনই কোনও মূর্খ বদ্ধ জীব পরম তত্ত্বের বিষয়বস্তুকে তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে, তখন সে নিতান্তই নিজের

নির্বুদ্ধিতাই ফুটিয়ে তোলে। পরমেশ্বর শ্রীভগবানই স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন, যা যথার্থ জ্ঞান-তত্ত্বের জ্বলন্ত অগ্নির মতো তেজোদ্দীপ্ত এবং তা দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত মানুষরা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু সামান্য জল্পনাকল্পনা এবং তত্ত্বকথা বলেছেন, তা সবই ভস্মীভূত করে দিয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে হৃষীকেশ অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়াদির ঈশ্বর বলা হয়। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠ দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি, ঘ্রাণশক্তি এবং আস্বাদন ক্ষমতা রয়েছে, তাই শ্রীহৃষীকেশের কৃপায় জীবগণও সীমিত পরিমাণে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ এবং আস্বাদন করতে পারে। এই ভাবধারাটি *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/১৮) অভিব্যক্ত হয়েছে—*প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ অন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ*—"পরম তত্ত্ব বলতে প্রত্যেকের প্রাণবায়ু, প্রত্যেকের চক্ষুর দর্শনশক্তি, প্রত্যেকের কানের শ্রবণশক্তি, এবং খাদ্য সংস্থানেরই সূত্র।" অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, পরমতত্ত্বকে তাঁর আপনার অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমেই অবগত হতে পারা যায়, এবং আমাদের বুদ্ধির নগণ্য পরিধির মধ্যে সর্বব্যাপী তত্ত্বসত্তার নিয়ে এসে আমাদের নির্বোধ প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে কোনই লাভ নেই। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৪/১) বলা হয়েছে—*যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*—"পরম তত্ত্বের রাজ্যে বর্ণনামূলক বাক্‌শক্তি বিফল হয়, এবং কল্পনাপ্রবণ মনঃশক্তি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না।"

কিন্তু যেহেতু ঐ সকল বৈদিক শ্রুতি সম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, তাই মানুষের কাছে ঐ সমস্ত বেদবাক্য পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—*শব্দোঽপিবোধক-নিষেধতয়াত্ম-মূলম্ অর্থোক্তম্ আহ*—যদিও বৈদিক শ্রুতি (শব্দ) পরম তত্ত্ব সম্পর্কে কল্পনা বিলাস করতে আমাদের নিষেধ করে থাকে, পরোক্ষভাবে ঐ সকল নিষেধাজ্ঞাসূচক অনুশাসনাদি পরম জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুকূল সিদ্ধান্তই গঠন করে। বাস্তবিকই, বৈদিক অনুশাসনগুলি মানসিক কল্পনার ভ্রান্ত পথ থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং অবশেষে ভক্তিমূলক আত্মসমর্পণের অভিমুখে মানুষকে উপনীত করতে পারে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*—সকল বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে অবগত হওয়া যায়। কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া, যেমন মানসিক কল্পনা যে নিরর্থক (*যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*), তা থেকে পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির অনুকূল যথার্থ একটি পথের অস্তিত্ব আছে। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*সর্বস্থ নিষেধস্য সাবধিত্বাৎ*—"প্রত্যেকটি নিষেধাত্মক অনুশাসনেরই একটি

বিশেষ পরিধি আছে বলে বুঝতে হবে। নিষেধাত্মক অনুশাসনাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা স্বীকার্য হতে পারে না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি নিষেধাত্মক অনুশাসনে বলা হয়েছে যে, কোনও জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সমকক্ষ কিংবা মহত্তর হতেই পারে না। তবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনবাসীদের সুগভীর প্রেমার্তির ফলে, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। তাই, যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুবদ্ধ করেন, এবং সমবয়স্ক গোপবালকেরা মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়ে কিংবা তাঁকে কুস্তি খেলায় পরাজিতও করে থাকে। নিষেধাত্মক অনুশাসনগুলি তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিব্য পরিবেশে সামঞ্জস্য করে নিতেই হয়।

যদিও পরমতত্ত্ব জাগতিক সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অতীত এবং তাই জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতার অতীত, তাই যখনই ঐ ধরনের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি ভগবৎপ্রেমের ধারায় সঞ্চারিত হয়, তখন সেইগুলি দিব্যভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *ভগবদ্গীতায়* (১১/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

"কিন্তু তোমার প্রাকৃত স্থূল চক্ষুর দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন করতে পারবে।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতেও* অনেক ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যেখানে পরমতত্ত্ব স্বয়ং আপনাকে তাঁর ভক্তের কাছে প্রকাশিত করেছেন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, পৃথু মহারাজ, কর্দম মুনি, পাণ্ডবগণ এবং গোপীদের ইতিকথায় রয়েছে। সুতরাং, বৈদিক তত্ত্ব সিদ্ধান্তে যে বলা হয়েছে, পরমতত্ত্ব সাধারণের দৃষ্টিশক্তির অতীত, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মাধ্যমে দিব্য চক্ষু লাভ করেনি। কিন্তু শ্রীভগবানের আপন দিব্য অনুভূতি যা

আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উৎস, তা শ্রুতি শাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে *কেনোপনিষদের* (১/৪) নিম্নলিখিত উক্তির মাধ্যমে—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদম্ উপাসতে ॥

"পরম ব্রহ্ম এমনই এক তত্ত্ব বলে বুঝতে হবে, যা জাগতিক বাক্‌শক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করতে পারা যায় না, সেই পরম তত্ত্ব থেকেই বাক্‌শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে।" *যেনবাগভ্যুদতে* অভিব্যক্তির শব্দগুলির অর্থ—পরমতত্ত্বের দ্বারাই অভিব্যক্ত আমাদের বাক্‌শক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বোঝানো হয়েছে যে, পরম তত্ত্বের নিজস্ব দিব্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি রয়েছে। সুতরাং তাঁকে হৃষীকেশ বলা হয়েছে।

শ্রীল নারদ মুনি বলেছেন, *হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিজস্ব সামর্থ্য দিয়ে পরম তত্ত্বের উপলব্ধি করতে পারা যায় না, তবে যখন প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনের মধ্যে নিয়োজিত থেকে শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াসী হই, তখন আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি অবশ্যই শ্রীভগবানের অনন্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, এবং তাই ভগবৎ কৃপায় তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি *ব্রহ্মতর্ক* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

আনন্দোনেদৃশানন্দ ইত্যুক্তে লোকতঃ পরম্ ।
প্রতিভাতি ন চাভাতি যথাবদ্ দর্শনং বিনা ॥

"পরমতত্ত্বের দিব্য আনন্দানুভূতির সঙ্গে জড়জাগতিক পৃথিবীর সাধারণ সুখানুভূতির তুলনা করা যায় না।" তেমনই, *বেদান্ত-সূত্রে* পরমতত্ত্বকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দে পরিপূর্ণ সত্ত্বা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটিতে শ্রীপিপ্পলায়ন পরম তত্ত্বের নিরাকার নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্য মোটামুটি বর্ণনা করেছেন। নবযোগেন্দ্রবর্গ স্বয়ং শ্রীভগবানেরই স্বরূপসত্ত্বার ভক্ত ছিলেন, তাই নিমিরাজ তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে অদ্বয়জ্ঞান তথা দিব্য অপ্রাকৃত বাস্তব সত্ত্বার সকল প্রকার বৈচিত্র্যময় প্রকরণাদির উৎস স্বরূপ পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পরম তত্ত্ব মর্যাদার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি শ্রুতি শাস্ত্রের মাধ্যমেও নিম্নরূপ শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে—*তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি*—"উপনিষদে অভিব্যক্ত পরম পুরুষ সম্পর্কে আমি অনুসন্ধিৎসু হয়েছি।"

যদি পরম তত্ত্ব বাস্তবিকই বাক্যের মাধ্যমে অর্জন করা দুঃসাধ্য হত, তা হলে যে বৈদিক শাস্ত্রে দিব্য শব্দসম্ভার সঙ্কলিত হয়েছে, তার কোনই অর্থ হত না। যেহেতু তত্ত্বকথার বৈদিক ভাষ্য অভ্রান্ত রূপে স্বীকার করতে হয়, তাই স্বীকার করা অসম্ভব যে, সকল ক্ষেত্রেই বাক্শক্তি সত্য তথা তত্ত্ব বর্ণনায় অক্ষম। বস্তুত, বৈদিক মন্ত্রগুলিই উচ্চারণের জন্য এবং শ্রবণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে মন অথবা বাক্য কোনটির দ্বারাই অগ্রসর হওয়া যাবে না (*নৈতান্ মনো বিশতি বাগুত*), এমন অনুশাসন সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে স্বীকার করা চলে না; বরং, যারা নির্বোধের মতো পরম তত্ত্বকে তাদের নিজেদের ক্ষুদ্র কল্পনাভিত্তিক চিন্তাশক্তির পরিধির মধ্যে পরম তত্ত্বকে আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই অনুশাসনটিকে সতর্কবাণী বলা যেতে পারে। যেহেতু বৈদিক অনুশাসনাদি, সদর্থক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক, সবই পরম তত্ত্বের বাস্তব সম্মত বিবরণরূপে স্বীকার করা উচিত, তাই বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রক্রিয়া (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) যে দিব্যজ্ঞানের ভক্তিভাবময় উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের ভাবগোচর হয়ে থাকে, তাকে এক প্রকার ভিন্ন প্রক্রিয়ারূপেই গণ্য করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্ত স্বরূপ যিনি সদ্গুরু রূপে কর্তব্য সাধন করেন, তাঁরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপরে এই প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে থাকে। তাই বলা হয়েছে—

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"শুধুমাত্র যে সকল মহাত্মার অন্তরে শ্রীভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়েরই প্রতি অচল বিশ্বাস থাকে, তাঁদের কাছেই অনায়াসে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের সকল সারাৎসার উদ্ভাসিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) শ্রীভগবান স্বয়ং *হরিবংশ* গ্রন্থে বলেছেন—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।
মমৈব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"হে ভারত, সেই পরম তত্ত্ব তথা পরব্রহ্ম আপনা হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে উদ্ভাসিত করেন হে ভারত।" *জ্ঞাতুম্ অর্হসি* শব্দসমষ্টি "তোমার অবশ্যই জানা উচিত" স্বয়ং শ্রীভগবান উচ্চারণ করেন, তাতে বোঝা যায় যে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধি অবশ্যই করা চাই, তবে সেই তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে মূর্খের মতো কল্পনায় কালক্ষেপ করা চলবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য উক্তি অনুসারে, শ্রীভগবানের দিব্য রূপকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিব্য অপ্রাকৃত মনে করতে হবে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও জড়জাগতিক কলুষতা নেই। সুতরাং, *নীলোৎপলদলশ্যামম্*, "শ্রীভগবানের রূপ ঘন নীল পদ্মফুলের পাপড়ির রঙে মনোরমভাবে উদ্ভাসিত" এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দিব্য গাঢ় নীল রঙেরই বর্ণনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি অহৈতুকি কৃপাময় হয়ে থাকেন, এমনকি যে সকল কনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ প্রেমের আস্বাদন লাভে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হচ্ছে, তাদের প্রতিও শ্রীভগবান কৃপাময় হন। অতএব শ্রীভগবান ক্রমশই বদ্ধজীবদের ইন্দ্রিয়াদি পরিশুদ্ধ করে দেন যাতে তারা শ্রীভগবানকে যথার্থ প্রেমভক্তি সহকারে সেবা করতে উৎসাহী হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *প্রাকৃত নীলোৎপল বর্ণত্বেন ভক্তৈর্ধ্যাতম্ অতাদৃশমপি*। প্রথম দিকে পূর্বকৃত জড়জাগতিক কাজকর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, ভক্ত শ্রীভগবানের দিব্য শ্রীবিগ্রহে মনোনিবেশ করেন এবং পৃথিবীর মধ্যে নানা রূপ, রঙের পরিবেশে ভগবানের আরাধনা করতে শেখেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *প্রাকৃত নীলোৎপলবর্ণত্বেন ভক্তৈর্ধ্যাতম্ অতাদৃশমপি*। প্রথম দিকে, পূর্বকৃত জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মে বদ্ধভাব সৃষ্টির ফলে, শ্রীভগবানের দিব্য রূপ বিগ্রহে মনোনিবেশের সময়ে ভগবদ্ভক্ত এই জগতের মধ্যে দৃষ্টমান পার্থিব রূপ ও বর্ণাদির বিষয়ে মনঃসংযোগ করে থাকতেও পারে। জড়জাগতিক রূপ ও বর্ণাদি বিষয়ে শ্রীভগবানের দিব্য রূপের কোনই সম্বন্ধ নেই, তবে এই ধ্যানমগ্নতার লক্ষ্য যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাই ঐ ধরনের ধ্যানমগ্নতা অবশেষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের যথার্থ রূপ, বর্ণ, ক্রিয়াকলাপ, লীলাবিলাস এবং পরিকরাদির দিব্য অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে। ভাষান্তরে বলা যায়, কোনও জাগতিক যুক্তি বিচারের উপরে দিব্য জ্ঞান নির্ভর করে থাকে না, বরং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। শ্রীভগবানকে অবহিত হওয়ার বিষয়ে ভগবদ্ভক্তের আন্তরিক প্রয়াসে যদি ভগবান সন্তোষ লাভ করেন, তা হলে অচিরেই শ্রীভগবান জড়জাগতিক যুক্তিবিচারের কূট তর্কাদি ও বৈদিক অনুশাসনাদি বলতে যা বোঝায়, সেই সমস্তই পরিষ্কার করে দেন এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন। পরমেশ্বর ভগবানের এই সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার না করলে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার কোনই আশা নেই। সুতরাং *কঠোপনিষদে* (১/৩/১২) বলা হয়েছে *দৃশ্যতে ত্ব গ্র্যয়া বুদ্ধ্যা*—পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হয় দিব্য বুদ্ধি উন্মেষেরই মাধ্যমে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সাথে জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির সংযোগের মাধ্যমে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তা নিতান্তই আনুমানিক জ্ঞান—তা কখনই যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির দ্বারা সঞ্চারিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের অনিত্য অভিজ্ঞতা থেকেই বাস্তব জ্ঞান গড়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতীয়তাবোধের একটা ভ্রান্ত ধারণার ফলেই বর্তমানে বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই, সারাজগতে বিবাদ ঘটে চলেছে, এবং জগদ্বিখ্যাত নেতারা তাদের বিভিন্ন দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি-বিকাশের জন্য কুকুর-বেড়ালদের মতো ঝগড়া করেই চলেছে। এইভাবেই, চোখ, নাক, জিভ, স্পর্শ এবং আস্বাদনের মাধ্যমে উপলব্ধ অনিত্য বিষয়াদির বর্ণনার জন্যই জড়জাগতিক ভাষার ব্যবহার চলে। এই ধরনের ভাষা এবং অভিজ্ঞতা পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগে না। কিন্তু চিদাকাশ থেকে দিব্য ধ্বনি তরঙ্গের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জড়জগতের কোনও একটি বিষয়বস্তু রূপে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বোধের মতো আমাদের জড়জাগতিক কল্পিত ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত এবং তাঁকে 'আত্মপ্রকাশ' অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত সত্তা রূপে অভিহিত করা হয়। তাই *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"জড়েন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, রূপ, গুণাবলী এবং লীলা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যখন বদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে, এবং তার জিহ্বাদি ব্যবহার করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে থাকে ও শ্রীভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করতে থাকে, তখন জিহ্বা পবিত্র হয়ে উঠে, এবং মানুষ ক্রমশ বুঝতে থাকে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কে।" যদি মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে, তখন তার দিব্যভাবসমৃদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশই শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করবার মতো সামর্থ্য লাভ করে থাকে। শুধুমাত্র বাস্তব ভাবধারা এবং জড়জাগতিক যুক্তিবাদ পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মাঝে সীমিত ভাবধারাই অভিব্যক্ত করতে পারে এবং যা কিছু নিত্যস্থিত, সেগুলির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩২) থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"জড়জাগতিক কলুষতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বৈষ্ণব পাদপদ্মের ধূলি যাদের দেহে সিঞ্চিত হয়নি, তারা জড়জাগতিক জীবনধারার দিকেই বেশি প্রবণতা লাভ করে, তাই অসাধারণ ক্রিয়াকলাপের জন্য মহিমান্বিত শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে সম্পৃক্ত হতে পারে না। শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে এবং ভগবদ্‌পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেই মানুষ জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।"

যদিও শ্রীপিপ্পলায়ন ব্যক্ত করছেন যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না, তা সত্ত্বেও ঋষিপ্রবর স্বয়ং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমেই পরমতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, এবং নিমিরাজ এই দিব্য ধ্বনি উপলব্ধি করতেও সক্ষম হচ্ছেন কারণ তিনি শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী নবযোগেন্দ্রবর্গের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করেছেন। সুতরাং, নির্বোধের মতো কেউ যেন এই শ্লোকটিকে নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপলব্ধি করবার প্রয়াস না করেন, বরং পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবান যে উপায়ে সব কিছুর পরম উৎস রূপে বিরাজমান, নিমিরাজ যেভাবে তা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তই যেন অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৩৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্ ।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে পরিগণিত; **ত্রিবৃৎ**—ত্রিবিধ; **একম্**—এক; **আদৌ**—সৃষ্টির প্রথমে; **সূত্রম্**—ক্রিয়াকর্মের শক্তি; **মহান্**—চেতনাশক্তি; **অহম্**—এবং মিথ্যা অহঙ্কার; **ইতি**—এইভাবে; **প্রবদন্তি**—বলা হয়ে থাকে; **জীবম্**—(মিথ্যা অহঙ্কারে আবৃত) জীব; **জ্ঞান**—জ্ঞানের আধার দেবতাগণ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়সকল; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসামগ্রী; **ফল**—সুখ-দুঃখ রূপে কর্মফল; **রূপতয়াঃ**—রূপধারণ করে; **উরু-শক্তি**—বিপুল নানা শক্তি সহ; **ব্রহ্ম-এব**—

একমাত্র পরমব্রহ্ম; ভাতি—প্রকটিত হয়; **সৎ অসৎ চ**—স্থূল বস্তুসামগ্রী এবং সেইগুলির সূক্ষ্ম কারণসমূহ; **তয়োঃ**—উভয়ে; **পরম্**—অতীত; যৎ—যা কিছু।

অনুবাদ

সৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরমব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তমো নামে আপনাকে প্রকটিত করেন, ব্রহ্ম আরও নানাভাবে আপনার শক্তি প্রসারিত করেন, এবং এইভাবে কর্মশক্তি ও চেতনাশক্তি প্রকটিত হয় আর সেই সঙ্গে মিথ্যা অহঙ্কার বদ্ধ জীবত্মার স্বরূপ আবৃত করে রাখে। এইভাবেই, পরম ব্রহ্মের বহুধা শক্তির প্রসার হওয়ার মাধ্যমে দেবতাগণ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি সহ সেইগুলির লক্ষ্য এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল—যথা, সুখ ও দুঃখ সমেত আবির্ভূত হন। এইভাবে সূক্ষ্ম কারণরূপে এবং স্থূল জড় জাগতিক সামগ্রীর রূপ নিয়ে জড়জাগতিক চাক্ষুষ কারণরূপে জড় জগতের প্রকাশ ঘটে। সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল সৃষ্টি প্রকাশের উৎস ব্রহ্ম একই সাথে পরম সত্ত্বা রূপে ঐ সব কিছুরই অতীত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ঋষি পিপ্পলায়ন পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ব্রহ্ম জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং মানসিক কল্পনার সীমার অতীত সত্ত্বা। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, *আত্মমূলম্ অর্থোক্তম্ আহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ* — বেদশাস্ত্রাদির নিষেধাত্মক অনুশাসনগুলি পরোক্ষভাবে পরম তত্ত্বের অস্তিত্ব নির্দেশ করে থাকে। এই পরম তত্ত্বের সন্ধানে যথাযথ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এখন, বর্তমান শ্লোকে, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বের অগণিত শক্তি আছে। (*উরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি*)। তাই পরম তত্ত্বের বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে জড় জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম বৈচিত্রগুলিও প্রকটিত হয়। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*কার্যং কারণাদ্ ভিন্নং ন ভবতি*—"কার্যের কারণ থেকে কার্য ভিন্ন থাকে না।" সুতরাং, পরমতত্ত্ব যেহেতু নিত্য বিরাজমান, তাই এই জড় জগৎ পরম ব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশ বলেই, অবশ্যই প্রকৃত সত্য রূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত, যদিও জড় জগতের বিবিধ অভিপ্রকাশ সবই অনিত্য এবং তাই মায়াময়। জড় জগতকে বাস্তব উপাদানসমূহের বিভ্রান্তিকর আদান প্রদানের মধ্যেই বিদ্যমান বলে মনে করতে হবে। বৌদ্ধ এবং মায়াবাদীগণের কল্পনাপ্রবণ ভাবধারায় জড় জগৎ অলীক মিথ্যা নয়; তারা মনে করে যে, জড় জগৎ দ্রষ্টার মনের বাইরে অবস্থান করে না। পরম তত্ত্বের শক্তি প্রকাশ রূপে জড় জগতের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু জীব মাত্রেই নির্বোধের মতো সেইগুলিকে নিত্যস্থিত মনে করার ফলে অনিত্য প্রকাশের মায়ায়

বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই এক প্রকার মায়াময় শক্তিরূপেই জড় জগৎ সক্রিয় রয়েছে এবং যে চিন্ময় জগতে সচ্চিদানন্দময় জীবনের অস্তিত্ব আছে, সেই সম্পর্কে জীবকে বিস্মৃত করে রেখেছে। যেহেতু জড় জগৎ এইভাবে বদ্ধজীবকে বিভ্রান্ত করে থাকে, তাই তাকে মায়াময় বলা হয়। যখন কোনও জাদুকর মঞ্চের উপরে তার কৌশল প্রদর্শন করতে থাকে, তখন দর্শকমণ্ডলী আপাতদৃষ্টিতে যা দেখতে থাকে, তা মায়াময়। তবে জাদুকর যথার্থই বিদ্যমান থাকে, এবং তার টুপিখানি আর খরগোশও থাকে, অবশ্য টুপির মধ্যে থেকে একটি খরগোশের আবির্ভাবটাই একটা মায়া। ঠিক সেইভাবেই, যখন জীব নিজেকে এই জড় জগতের অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচয় প্রদান করে, ভাবে, "আমি আমেরিকার লোক", "আমি ভারতবাসী", "আমি রাশিয়ান", "আমি কালো মানুষ", "আমি শ্বেতাঙ্গ", তখন সে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির জাদুর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েই থাকে। বদ্ধ জীবকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, "আমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় আত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। এখন আমাকে সমস্ত অহেতুক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হবে, যেহেতু আমি তাঁর অংশ।" তখন সে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। যদি কেউ কৃত্রিম উপায়ে মায়াশক্তির প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টায় বলতে থাকে যে, মায়াশক্তি বলতে কিছু নেই এবং এই জগৎ মিথ্যা, তা হলে সে নিতান্তই মায়ারই অন্য এক শক্তির প্রভাবে নিজেকে অজ্ঞতার অন্ধকারেই রেখে দিতে চায়। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

মায়ার অধিপতি মায়াধীশের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ না করলে মায়ার কবল থেকে মুক্তি প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। মায়াশক্তি বলে কিছুই নেই, এমন শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে বাগাড়ম্বর করা নিরর্থক, কারণ মায়া বাস্তবিকই *দুরত্যয়া* অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। তবে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াশক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

এই শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম থেকে জড়জগতের অভিপ্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অধীনস্থ বৈশিষ্ট্যাদির অন্যতম প্রকাশ ব্রহ্ম (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*), তাই যিনি এই জড় জগতটিকে ব্রহ্ম রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং মানসিক কল্পনার মাধ্যমে জড়া শক্তিকে আপন স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যেহেতু ব্রহ্মকে *একম্* অর্থাৎ একমাত্র সত্তা বলা হয়, তাই পার্থিব জগতের অগণিত বৈচিত্র্যের মধ্যে তা কেমন করে প্রকটিত হন? তাই এই শ্লোকে *উরুশক্তি* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরম তত্ত্বের মধ্যে বহুবিধ শক্তি আধারিত থাকে, সেকথা বেদশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*)—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*। পরম তত্ত্ব শক্তি নন, বরং শক্তিমান, অগণিত শক্তিপুঞ্জের অধিকারী। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, পরম তত্ত্বের এই সকল প্রামাণ্য বর্ণনা বিনম্রভাবে মানুষের শ্রবণ করা উচিত। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, *যথানলম্ অর্চিষঃ স্বাঃ*—যে প্রজ্বলিত অগ্নি ঔজ্জ্বল্যের উৎস, সেই অগ্নিকে আরও আলোকিত করবার কোনও ক্ষমতাই সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে থাকে না। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ক্ষুদ্রস্ফুলিঙ্গের অতি সামান্য যে জীব, সে কখনই তার নগণ্য বুদ্ধির ক্ষমতা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভাবোজ্জ্বল করে তুলতে পারে না। কেউ হয়ত তর্ক করতে পারে যে, সূর্য তার কিরণধারার আকারে তার শক্তি বিস্তার করতে থাকে এবং সেই কিরণরাশির উজ্জ্বলতার মাধ্যমেই তো আমরা সূর্যকে দেখতে পারি। ঠিক এইভাবেই, পরমতত্ত্বের শক্তির বিস্তারের ফলেই তাকে আমাদের উপলব্ধি করতে পারা উচিত। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সূর্য যদি আকাশ ঢেকে একটি মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সূর্যকিরণ উপস্থিত থাকলেও সূর্যকে দেখা যেতে পারে না। অতএব, শেষ পর্যন্ত সূর্যকে দেখবার ক্ষমতা শুধুমাত্র সূর্যকিরণের উপরেই নির্ভরশীল নয়, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আকাশ, যা সূর্যেরই ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে, তারও দরকার আছে। তেমনই, এই শ্লোকে যেভাবে বলা হয়েছে, পরমতত্ত্বের শক্তিরাশির বিস্তারের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব মানুষ উপলব্ধি করতে পারে।

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে জড় ইন্দ্রিয়াদি এবং মনের শক্তি নস্যাৎ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখানে যে সমস্ত প্রামাণ্য বর্ণনাদি বিবৃত হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি রূপে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সব কিছুরই উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদ মুনি নিম্নরূপ উপদেশ রাজা প্রাচীনবর্হিকে দিয়েছিলেন—

অতস্তদ্ অপবাদার্থং ভজ সর্বাত্মনা হরিম্ ।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥

"সর্বদা জেনে রাখা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়ে থাকে। পরিণামে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

অভিপ্রকাশের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসই শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এই শুদ্ধ সার্থক জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানবান হতে হলে মানুষের সর্বদাই নিজেকে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত রাখা উচিত।" (*ভাগবত* ৪/২৯/৭৯) এখানে তাই বলা হয়েছে—*ভজ সর্বাত্মনা হরিম্*—পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা অবশ্যই করতে হবে যাতে পরিষ্কার নীল আকাশে যেমন পূর্ণ শক্তিময় সূর্য প্রতিভাত হয়ে থাকে, তেমনই মানুষের চেতনা শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে। ঠিক তেমনই, যদি মানুষ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তার মন থেকে জাগতিক কলুষতা পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং তাই শুধুমাত্র শ্রীভগবানকেই নয়—চিন্ময় জগৎরূপে শ্রীভগবানের বিপুল অভিপ্রকাশ, তাঁর শুদ্ধভক্তমণ্ডলী রূপে, পরমাত্মা রূপে, নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপে এবং তার পরিণামে জড়জাগতিক পৃথিবীর সৃষ্টি রূপেও শ্রীভগবানের ধামের ছায়া (*ছায়েব*) রূপে, যার মাঝে অসংখ্য জড়জাগতিক বৈচিত্র অভিব্যক্ত রয়েছে, তা সবই প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *ফলম্*, শব্দটির অর্থ *পুরুষার্থ-স্বরূপম্*, অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যের যথার্থ রূপ, কিংবা, ভাষান্তরে, স্বয়ং শ্রীভগবানের দিব্য রূপ অর্থেও বুঝতে পারা যায়। জীব তার যথার্থ শুদ্ধস্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সত্ত্বা থেকে ভিন্ন হয়। তেমনই, বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত ভগবদ্ধামের অনন্ত বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্যও শ্রীভগবানের গুণবৈশিষ্ট্য থেকে অভিন্ন বলেই স্বীকৃত। তাই যখনই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর অতুলনীয় ঐশ্বর্য সহকারে, এবং তাঁর শুদ্ধ দিব্য সেবকবৃন্দ, ও জীবগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং বিরাজিত হন, তখন এক অতি সুখকর পরিবেশ রচিত হয়। শ্রীভগবান যখন ঐভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরিপূর্ণ দিব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে সম্মিলিত হন, তখন যে সুখময় পরিবেশ রচিত হয়, তাকে জড়জাগতিক পরিবারের ধারণায় অভিহিত করলে তা বিকৃত প্রতিফলন রূপে গণ্য হবে। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যমণ্ডিত নিত্যধামে তাঁর সাথে সম্মিলিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রত্যেক জীবেরই রয়েছে। তাই এই শ্লোকটি থেকে বোঝা উচিত যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম অভিপ্রকাশের মধ্যেই শ্রীভগবানের শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং তাই সেই সবই শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা উচিত। *ঈশাবাস্যম্* ইদং *সর্বম্।*

শ্রীল জীব গোস্বামী বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে প্রতিপন্ন করেছেন যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশই পরম তত্ত্বের স্বাভাবিক শক্তিপ্রকাশ। অনেক সময়ে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বলে থাকে যে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সবই কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং শ্রীভগবান ঐরকম একটি শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে চলেছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সম্যক্ মর্যাদা সম্পর্কে ঐ ধরনের বিপুল অজ্ঞতা দূর করা যেতে পারে। কোনও একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গকে যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে একটি বিচ্ছুরণ বলা চলে, তেমনই যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শক্তিমত্তার একটি অতি নগণ্য স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাই শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"কিন্তু অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এই মাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি এবং এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছি।" সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতপক্ষে সকল জীবেরই সুহৃদ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। সুতরাং, যদি মানুষ যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বুঝতে পারে যে, সকলের কল্যাণকামী সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর উৎস এবং নিয়ন্তা, তা হলে সে অচিরে শান্তিলাভ করতে পারে (*জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি*)। যখনই মানুষ নির্বোধের মতো মনে করে যে, জগৎ সৃষ্টির একটি মাত্র অণু-পরমাণুও পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি নয়, তখন তার মনে ভয় ও মায়ামোহ সৃষ্টি হতে থাকে। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।* জড় জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলেও অতি বিপজ্জনক ভয়াবহ মায়ামোহ সৃষ্টি হয়। উভয় ধরনেরই নিরীশ্বরবাদ—যথা, জড় জগতটিকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করা (এবং তার ফলে সেটি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ভোগ্য বিষয় বলেই ধরে নেওয়া), আবার সেই জড় জগতেরই অস্তিত্ব অলীক বলে তত্ত্ব প্রচার করা—তা পরমেশ্বর ভগবান যিনি সবকিছুরই যথার্থ মালিক এবং ভোক্তা, তাঁর কাছে চিরন্তন অধীনতাকে অস্বীকার করবারই বৃথা অপচেষ্টা মাত্র। শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নরূপ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করেছেন, যা *বিষ্ণু পুরাণের* (১/৩/১) মধ্যে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি একদা মহামুনি শ্রীপরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদি কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥

"কেমন করে আমরা বুঝব যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিকর্তা, যদিও তা সকল গুণের অতীত, অপরিমেয়, নিরাকার, এবং ত্রুটিমুক্ত মনে হয়?" এর উত্তরে শ্রীপরাশর মুনি বলেছিলেন—

শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যাভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

"জড় জাগতিক বস্তুসামগ্রীও কিভাবে তাদের শক্তি বিস্তার করতে থাকে, শুধুমাত্র যুক্তিবাদের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করতে পারা যায় না। পরিণত পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই এই সব বিষয়াদি উপলব্ধি করা যেতে পারে। অগ্নি যেভাবে তাপশক্তি বিকীরণ করে থাকে, সেইভাবেই পরম তত্ত্ব তাঁর শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ১/৩/২) শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনও মূল্যবান রত্নের শক্তির পরিচয় পেতে হলে, সেই সম্পর্কে যুক্তিবাদী বর্ণনা দিলেই বোধগম্য হয় না, বরং সেই রত্নটির প্রভাব প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই তা বুঝতে হয়। তেমনই, কোনও মন্ত্রের প্রভাব বুঝতে হলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে হয়। কোনও প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণার মাধ্যমে সেই প্রভাব বোঝানো যায় না। মানুষের দেহের পক্ষে উপকারী ফলপ্রদায়ী কোনও গাছ যে বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, তা কোনও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। হয়ত কেউ তর্ক করে বোঝাতে চায় যে, সমস্ত গাছটির বংশোদ্ভব তত্ত্বের মুল উপাদান গাছটির বীজের মধ্যেই থাকে। কিন্তু বীজটির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কোনও প্রকার যুক্তি বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না, কিংবা বীজটি থেকে বিশাল বৃক্ষ গড়ে উঠার জন্যও কোন যুক্তি তর্কের দরকার হয় না। কোনও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে, তা নিয়ে আইনজ্ঞের মতো যুক্তিজাল সৃষ্টি করার মতো অর্থাৎ বিস্ময়কর জড়া প্রকৃতি অভিব্যক্ত হওয়ার পরে, নির্বোধ জড় জাগতিক বিজ্ঞানী নানা ঘটনাবলীর আপাত যুক্তিবাদী পারম্পর্য বিচারের মাধ্যমে একটি বীজের উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা অন্বেষণ করতে শুরু করে। কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ বলতে যা বোঝায়, তার পরিধির মধ্যে এমন কোনও তত্ত্ব নেই, যার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে, একটি বীজ থেকে একটি গাছের বিস্তার হতেই হবে। বরং, ঐ ধরনের বিস্তারকে বৃক্ষের শক্তি বলেই স্বীকার করতে হবে। ঠিক তেমনই, কোনও রত্নের ক্ষমতা বলতে বোঝায় সেটির রহস্যময় শক্তি আছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রাবলীর মধ্যেও

অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকে। অবশেষে বলতে হয় যে, মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এর মধ্যেও এমন ক্ষমতা রয়েছে, যার দ্বারা মানুষকে সচ্চিদানন্দময় দিব্য জগতে নিয়ে যাওয়া যায়। এইভাবেই, অগণিত বিবিধ পার্থিব এবং দিব্য জগতের মধ্যে আপন সত্ত্বা বিস্তারিত করার স্বাভাবিক গুণশক্তি পরম তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে। আমরা হয়ত যুক্তির দ্বারা এই শক্তি বিস্তারের তত্ত্বটি সংঘটিত হওয়ার পরে বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু পরম তত্ত্বের বিস্তার আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যে মানুষ অন্ধ নয়, সে যেভাবে একটি বীজ থেকে একটি বৃক্ষ বিস্তারের সত্যটি লক্ষ্য করতে পারে, তেমনই যে বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে আপন চেতনা শুদ্ধ করে তোলে, এখানে বর্ণিত পরম তত্ত্বের বিস্তার সে বিজ্ঞান সম্মতভাবেই লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়। কোনও বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি কল্পনা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, বরং বাস্তব পর্যবেক্ষণের ফলেই তা বোঝা যায়। তেমনই, মানুষ যাতে পরম তত্ত্বের সম্প্রসারণ বাস্তবে লক্ষ্য করতে পারে, তার জন্য অবশ্যই তার দর্শন ক্ষমতা শুদ্ধ করে তুলতে হবে। ঐ দর্শন বা পর্যবেক্ষণ চক্ষু বা কর্ণ যে কোনটির মাধ্যমেই হতে পারে। বৈদিক জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দময় তরঙ্গের মাধ্যমে দিব্য শক্তির প্রকাশ। সুতরাং, দিব্য ধ্বনি তরঙ্গ শ্রবণের সশ্রদ্ধ অভ্যাস করার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করা যেতে পারে। *শাস্ত্রচক্ষুঃ*। যখন মানুষের চেতনা পরিপূর্ণ শুদ্ধতা লাভ করে, তখনই তার দিব্য শক্তিসম্পন্ন সকল চেতন-ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রভাব থাকে না, তবে যেহেতু তিনি দিব্য গুণাবলীর পরম আধার মহাসমুদ্র এবং তাই পার্থিব জগতের নিকৃষ্ট গুণাবলীতে তাঁর কোনই প্রয়োজন থাকে না। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/১০) তাই বলা হয়েছে, *মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্*—"বুঝতে হবে যে, মায়া এক জড়াশক্তি, আর পরমেশ্বর ভগবান মায়ার অধিপতি।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্* মায়া সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে যেভাবে বোঝা যায় যে, জড় জগৎ শ্রীভগবানের নিরাকার ব্রহ্ম শক্তির থেকেই উৎপত্তি, তেমনই ব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্তির অংশ প্রকাশ—যেকথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মে কোনও দিব্য ক্রিয়াকলাপ নেই কিংবা পরম *পুং-অর্থ*, অর্থাৎ মানব জীবনের কোনও যথার্থ উপকার তথা কল্যাণার্থে প্রেম বা ভগবৎ-প্রেমেরও অস্তিত্ব নেই। অতএব, যদি কেউ ব্রহ্ম নামে অভিহিত শ্রীভগবানের দেহরূপের জ্যোতিবিকাশের দ্বারা তার নিজ অপরিণত পর্যায়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থই অবহিত হতে না পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য আনন্দময় স্বরূপ প্রকাশের সাথে আপনার নিত্য একাত্ম পরিচয়ের সত্তাও যথার্থে উপলব্ধি করবার কোনও সম্ভাবনাই তার জীবনে থাকে না। এই বিষয়টি *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (আদি ১/১/৩) সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে—

যদ্ অদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্লোক ৩৮

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি ।
সর্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৩৮ ॥

ন—কখনই নয়; **আত্মা**—আত্মা; **জজান**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ন**—কখনই নয়; **মরিষ্যতি**—মৃত্যু হবে; **ন**—না; **এধতে**—বৃদ্ধি; **অসৌ**—এই; **ন**—করে না; **ক্ষীয়তে**—ক্ষয়প্রাপ্ত হতে; **সবন-বিৎ**—কালক্রমের এই পর্যায়গুলি সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞ; **ব্যভিচারিণাম্**—যেভাবে সেইগুলি অন্যান্য পরিবর্তনশীল সত্তার মধ্যে ঘটে থাকে; **হি**—অবশ্য; **সর্বত্র**—সকল ক্ষেত্রে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **অনপায়ি**—কখনও তিরোহিত হয় না; **উপলব্ধি-মাত্রম্**—শুদ্ধ চেতনা; **প্রাণঃ যথা**—দেহ মধ্যে প্রাণবায়ুর মতোই; **ইন্দ্রিয়-বলেন**—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি মাধ্যমে; **বিকল্পিতম্**—বিভক্ত রূপে কল্পিত; **সৎ**—হয়ে থাকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মরূপে শাশ্বত আত্মার কখনই জন্ম হয়নি এবং কখনই মৃত্যু হবে না, এবং তার বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় হয় না। সেই চিন্ময় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক শরীরের পরিবর্তনশীল যৌবন, প্রৌঢ়তা এবং মৃত্যুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। তাই আত্মাকেই শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ সর্বত্র সর্বকালের জন্যই বিদ্যমান এবং অক্ষয় সত্ত্বা বলে জানতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ু একটি হলেও তা যেমন বিভিন্ন জড়েন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বহুধারূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনই একটি আত্মা জড় দেহের সংস্পর্শে এসে বিবিধ জড় জাগতিক অভিধা গ্রহণ করে থাকে।

তাৎপর্য

বৈদিক সারমন্ত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—"সকল কিছুই ব্রহ্ম", *ভাগবতের* এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সকল বিষয়েরই মূল উৎস। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার সাধনের মাধ্যমে, তিনি চিন্ময় জগৎ অভিব্যক্ত করেন, এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বিস্তার সাধনের মাধ্যমে তিনি জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করেন। বদ্ধ জীব মূলত শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গা শক্তি, তবে মায়ার সংস্পর্শে এসে, বহিরঙ্গা শক্তির কবলে সে পতিত হয়। যেভাবেই হোক, সবকিছুই যেহেতু পরম ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার, তাই সবকিছুই শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদ্ অপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ*। যখন জীব মনে করে যে, জড়জাগতিক পৃথিবী শ্রীভগবানের শক্তির অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ নয়—নিতান্তই পৃথক একটি সত্ত্বা, যাকে ক্ষুদ্র জীবাত্মাও নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করতে পারে, তখন তার *বিপর্যয়ঃ* অর্থাৎ বিপজ্জনক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাকে বলা চলে *অস্মৃতিঃ*। তার ফলে জীব বিস্মৃত হয়ে যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুর মালিক, সব কিছুই শ্রীভগবানের বিস্তারিত অংশপ্রকাশ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যদিও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা এবং মৃত্যুর মতো নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে, তা হলেও নির্বোধের মতো কারও সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবসত্ত্বাও এই সকল পরিবর্তনের অধীন। জীব সত্ত্বা এবং জড়া প্রকৃতি উভয়েই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, যা পরম ব্রহ্মেরই অংশপ্রকাশ। তবে বেদশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—শ্রীভগবানের শক্তিরাশি *বিবিধা* অর্থাৎ বহুপ্রকার। তাই, এই শ্লোকটি অনুসারে, *নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে*—আত্মা কখনই জন্মগ্রহণ করে না, কখনও সে

মরে না, এবং অবশ্যই জড় দেহের মতো বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় তার হয় না। যদিও পরিদৃশ্যমান জড় দেহ বাল্যকাল, কৈশোর-যৌবন এবং বার্ধক্যের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, কিংবা যদিও কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ গাছপালা কিংবা পশুপাখি হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, তা সত্ত্বেও চিন্ময় আত্মা কখনই তার নিত্য শাশ্বত স্বরূপ অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয় না। বরং জড় জাগতিক শরীরের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তনকেই সে স্বরূপ জ্ঞান করে এবং তার ফলে মায়ামোহ নামে এক প্রকার মানসিক অবস্থায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এইভাবে নিজেকে পরিবর্তিত হতে দেখে এবং পরিণামে প্রকৃতির নিয়মাধীন ব্যবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যেতে হবে তা লক্ষ্য করার ভয়াবহ মায়ামোহ অভিজ্ঞতা থেকে যে বিভ্রান্তি জাগে, তা শ্রীভগবানের পরম শক্তি স্বরূপ মানুষের নিত্য সত্তার দিব্য জ্ঞানের দ্বারা নস্যাৎ করা যেতে পারে।

এই শ্লোকে *সর্বত্র* শব্দটি থেকে নির্বোধের মতো অপব্যাখা করা উচিত হবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মা সর্বব্যাপী। আত্মার জন্ম হয় না, তাছাড়া তার মৃত্যুও হয় না। তা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার মাঝে আমাদের শরীরের জন্ম ও মৃত্যুর সাথে আমরা বৃথাই আত্মস্থজ্ঞান করে থাকি। সুতরাং, সর্বব্যাপ্ত আত্মা যেহেতু কখনই মায়ামোহের কবলে পতিত হতে পারে না, তেমনই *সর্বত্র* শব্দটিও জীবাত্মার সর্বব্যাপকতা বোঝাতে পারে না। মায়া বলতে বোঝায় বাস্তব তত্ত্বের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি, যা কোনও সর্বব্যাপী সত্তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং *সর্বত্র* শব্দটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে যে, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা সকল জড়জাগতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির মাঝেই বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গভীর নিদ্রার মধ্যে চেতনার বহিপ্রকাশ না ঘটতে পারে, এবং তা হলেও শরীরের মধ্যে চিন্ময় আত্মার উপস্থিতি রয়েছে বলেই বুঝতে হবে। সেইভাবেই, *ভগবদ্গীতা* থেকে জানা যায় যে, চিন্ময় আত্মা (*নিত্যঃ সর্বগতঃ*) অগ্নি, জল কিংবা মহাশূন্যেও থাকতে পারে, যেহেতু আত্মার উপস্থিতি কখনই জড়জাগতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল হয় না, আত্মার উপস্থিতি নিত্যতত্ত্ব। বিশেষ জড়জাগতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সম্ভাবনার মাঝে আত্মার চেতনা কিছুটা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, যেমন বৈদ্যুতিক আলো বিশেষ তেজ এবং বর্ণ নিয়ে বৈদ্যুতিক বাল্‌ভের উপরে নির্ভর করে বিকশিত হতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি একটাই শক্তি, কিন্তু তা জাগতিক বিভিন্ন পরিবেশের অনুযায়ী নানাভাবে রূপায়িত হয়।

যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, চিন্ময় আত্মা যদিও শুদ্ধ চেতনা (*উপলব্ধি মাত্রম্*), তা হ ও আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, চেতনা নিত্যনিয়ত

পরিবর্তিত হতে থাকে। যদি আমি আকাশের মতো একটি নীল বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করে থাকি, তা হলে তখন আমার মনের মধ্যে কোনও হলুদ রঙের বিষয়বস্তু, যেমন কোনও ফুলের চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই, যদি আমি বুঝতে পারি যে, আমার ক্ষুধা হয়েছে, তখনও আমার নীল আকাশের চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে, চেতনা নিত্যনিয়তই রূপ পরিবর্তন করছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন যে, চেতনা অবশ্যই স্বরূপত নিত্য সত্ত্বা বিশিষ্ট, কিন্তু জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে তা বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণবায়ুর দৃষ্টান্ত খুবই উপযোগী। প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু এক পরম সত্ত্বা, তবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে সেটি দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, এবং এই রকম নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। তেমনই, চেতনাও চিন্ময় সত্ত্বা হলেও সেটিও অদ্বিতীয় সত্ত্বা, কিন্তু যখনই বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে আসে, তখনই তাকে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়মূলক ক্রিয়াকলাপের ভাবধারায় উপলব্ধি করতে পারা যায়। কিন্তু চেতনার সত্ত্বা এমন একটি নিত্য তত্ত্ব যার পরিবর্তন করা চলে না, তবে সাময়িকভাবে তা মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে।

যখন কেউ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে, তখনই তাকে ধীর মনোভাবাপন্ন বলে বুঝতে হবে (*ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*)। সেই সময়ে মানুষ আর জড়া প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে তার চেতনার স্বরূপ নিয়ে ব্যর্থ বিভ্রান্তির কবলায়িত হয় না।

তত্ত্বমসি ভাব-অভিব্যক্তি থেকে *ছান্দোগ্য উপনিষদের* দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, চিন্ময় জ্ঞান নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব নয়, বরং জড় দেহের মধ্যে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মাকে ক্রমশ উপলব্ধি করবার উপায়। ঠিক যেমন *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বারে বারে বলেছেন *অহম্* অর্থাৎ "আমি" তেমনই এই বৈদিক বাণী *ত্বম্* অর্থাৎ "তুমি" শব্দের মাধ্যমে বোঝায় যে, পরম তত্ত্ব যেমন, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, সেই রকম ব্রহ্ম (তৎ)-এর একক স্ফুলিঙ্গও এক নিত্য পুরুষ-তত্ত্ব (*ত্বম্*)। অতএব, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই বিষয়ে অনুধাবন করতে হবে যে, ব্রহ্মের এক-একটি স্ফুলিঙ্গ নিত্য চেতন সত্ত্বা। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম তত্ত্বের নিরাকার নির্বিশেষ ভাবধারা উপলব্ধির জন্য চেষ্টার মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে, জীব তত্ত্বের পর্যায়ে নিত্য-চেতন জীব সত্ত্বা রূপেই মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করাই উচিত, কারণ নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব নিতান্তই অস্থায়ী জড়জাগতিক বৈচিত্রের অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষান্তরে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য চেতন সেবক মনে করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *মহাভারতের* মোক্ষধর্ম অংশ থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেছেন—

অহং হি জীব সংজ্ঞো বৈ ময়ি জীবঃ সনাতনঃ ।
মৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং দৃষ্টো জীবো ময়েতি হ ।
অহং শ্রেয়ো বিধাস্যামি যথাধিকারম্ ঈশ্বরঃ ॥

"জীব সত্ত্বা আমার থেকে পৃথক নয়, কারণ সে আমারই অংশ প্রকাশ। তাই আমার মতো জীব নিত্য সত্ত্বা, এবং সর্বদাই আমার ভিতরেই অবস্থান করে থাকে। তবে বৃথা চিন্তা করা উচিত নয়, 'এখন আমি আত্মার দর্শন পেয়ে গেছি।' বরং আমি, পরমেশ্বর ভগবান বলেই, তোমাদের সেই আশীর্বাদ বিধান করব যাতে তোমরা সেই অধিকারের যোগ্য হয়ে উঠতে পার।"

শ্লোক ৩৯

অণ্ডেষু পেশীষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥ ৩৯ ॥

অণ্ডেষু—অণ্ড থেকে সৃষ্ট জীবযোনি; **পেশীষু**—ভ্রূণ মধ্যে; **তরুষু**—বৃক্ষলতার মধ্যে; **অবিনিশ্চিতেষু**—অনিশ্চিত যোনি থেকে সৃষ্ট জীব (ঘর্মকণা থেকে উৎপন্ন); **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **হি**—অবশ্য; **জীবম্**—জীবাত্মা; **উপধাবতি**—অনুসরণ করে; **তত্র তত্র**—এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি; **সন্নে**—তারা সন্নিবিষ্ট হয়; **যৎ**—যখন; **ইন্দ্রিয়গণে**—সকল ইন্দ্রিয়াদি; **অহমি**—মিথ্যা অহঙ্কার; **চ**—আরও; **প্রসুপ্তে**—গভীর নিদ্রায়; **কূটস্থঃ**—অপরিবর্তিত; **আশয়ম্**—কলুষিত চেতনার সূক্ষ্ম আবরণ, লিঙ্গশরীর; **ঋতে**—ব্যতীত; **তৎ**—তাহা; **অনুস্মৃতিঃ**—পরবর্তীকালের স্মরণ ক্ষমতা; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

পার্থিব জগতে চিন্ময় আত্মা বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতির মাঝে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কতকগুলি প্রজাতি ডিম্বাদি থেকে জন্মগ্রহণ করে, অন্যগুলি ভ্রূণ থেকে, আরও অনেকগুলি তরুলতার বীজ থেকে, এবং বাকি সব ঘর্মকণা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। তবে জীব-প্রজাতির সকল ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ু অপরিবর্তিতই থাকে এবং এক শরীর থেকে অন্য এক শরীরে চিন্ময় আত্মার অনুসরণ করতে থাকে।

সেইভাবেই, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক জীবনধারার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিত্যকাল নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ভাবেই বিরাজিত থাকে। এই সম্পর্কে আমাদের বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যখন আমরা স্বপ্ন না দেখেই গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকি, তখন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, এবং মন ও অহঙ্কারও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং মিথ্যা অহম্ বোধ যদিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবুও জাগ্রত হয়ে মানুষ নিদ্রা থেকে উত্থানের পরে মনে করতে পারে যে, আত্মারূপে সে শান্তিতে নিদ্রামগ্নই ছিল।

তাৎপর্য

যখন জীব জাগ্রত থাকে, জড়েন্দ্রিয়গুলি এবং মন তখন নিত্য সক্রিয় হয়ে থাকে। ঠিক তেমনই, যখন কেউ ঘুমায়, তখন মিথ্যা অহম্ বোধ তার জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাগুলি সংগ্রহ করে থাকে এবং তাই ঘুমের সময়ে মানুষ স্বপ্নাদি কিংবা স্বপ্নাদির নানা অংশ দেখতে থাকে। তবে প্রসুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার সময়ে, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এবং অহম্ বোধ আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা বা বাসনাদি মনে করতে পারে না। সূক্ষ্ম মন এবং অহম্ বোধকে বলা হয় *লিঙ্গ-শরীর*, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড় দেহ। এই লিঙ্গ-শরীর অস্থায়ী জড়জাগতিক পরিচয়াদি যথা, "আমি ধনী", "আমি শক্তিমান", "আমি কালো", "আমি সাদা", "আমি আমেরিকান", "আমি চীনা" এই ধরনের অভিজ্ঞতা পোষণ করতে থাকে। মানুষের নিজের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা সমষ্টিকে বলা হয় অহঙ্কার। আর জীবন সম্পর্কে এই মায়াময় বিভ্রান্তিকর ধারণার ফলেই জীব এক প্রজন্ম থেকে অন্য একটিতে দেহান্তরিত হতে থাকে, যা সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* বোঝানো হয়েছে। চিন্ময় আত্মা অবশ্যই তার সচ্চিদানন্দময় নিত্য স্বরূপ মর্যাদা পরিবর্তন করে না, তবে আত্মা হয়ত অস্থায়ীভাবে এই মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে থাকতেও পারে। তুলনীয় একটি পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, রাত্রে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে যে, সে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ফলে ঐ স্বপ্নটির প্রভাবে তার ঘরের মধ্যে যথার্থই তার বিছানায় শুয়ে থাকার অবস্থাটির কোনই পরিবর্তন হয় না। তাই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, *কূটস্থ আশয়ম্ ঋতে*—সূক্ষ্ম ভঙ্গুর শরীরের রূপান্তর হলেও চিন্ময় আত্মার পরিবর্তন হয় না। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার জন্য নিম্নরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। *এতাবন্তং কালং সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্/ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্*। মানুষ প্রায়ই চিন্তা করে, "আমি খুব সুখে ঘুমাচ্ছিলাম, তবে স্বপ্ন দেখিনি কিংবা কোনও কিছুই জানি না।" যুক্তিবিচারে মনে করা যেতে পারে যে, মানুষের যে বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি, তা সে স্মরণ

করতে পারে না। তাই, কোনও রকম মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা না হলেও যদি কেউ শান্তিতে ঘুমানোর কথা মনে করতে পারে, তা হলে সেই ধরনের স্মৃতি অর্থাৎ মনে করার ব্যাপারটিকে চিন্ময় আত্মার অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা বলেই বোঝা উচিত।

শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর গ্রহমণ্ডলীতে মানবরূপী এক উন্নত জাতি, যাঁদের দেবতা বলা হয়, তাঁরা বাস্তবিকই সাধারণ মানবজাতির মতো গভীর ঘুমের স্থূল অজ্ঞানতার মধ্যে কালযাপন করেন না। যেহেতু দেবতাদের উন্নত বুদ্ধি থাকে, তাই তাঁরা নিদ্রাকালে অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জমান হন না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মত্তঃস্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*। নিদ্রাকে *অপহনম্* অর্থাৎ বিস্মৃতি বলা হয়েছে। কোনও সময়ে স্বপ্নের মাধ্যমে স্মৃতি অর্থাৎ মানুষের যথার্থ পরিবেশ-পরিস্থিতির জ্ঞান সক্রিয় থাকে, যদিও স্বপ্নের মধ্যে মানুষ তার পরিবার-পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের এক ধরনের পরিবর্তিত, মায়াময় অবস্থায় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কিন্তু স্মৃতি ও বিস্মৃতির ঐ ধরনের সমস্ত অবস্থাতেই হৃদয়ে পরমাত্মার অবস্থানের ফলেই তা সংঘটিত হতে থাকে। পরমাত্মার কৃপায় মানুষ কোনও প্রকার মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা ছাড়াই মনে করতে পারে কিভাবে সে শান্তিতে বিশ্রাম করছিল এবং তার ফলেই আত্মার প্রাথমিক ক্ষণিক দর্শন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়।

এই শ্লোকটির প্রামাণ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা অনুসারে, *অবিনিশ্চিতেষু* শব্দটির অর্থ *স্বেদজেষু*, অর্থাৎ স্বেদজাত। শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ভূস্বেদেন হি প্রায়ো জায়ন্তে*—পৃথিবীর শিশিরবিন্দুকে পৃথিবীর ঘর্মবিন্দুরূপে বিবেচনা করতে হবে এবং শিশিরবিন্দু থেকে বিভিন্ন জীব প্রজন্ম উৎপন্ন হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে (৩/১/৯) প্রাণবিষয়ক আত্মার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে—

এষোঽণুর আত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বম্ ওতম্ প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥

"আত্মার আকার পরমাণুর মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং যথার্থ বুদ্ধির মাধ্যমে তাকে বুঝতে পারা যায়। এই পারমাণবিক আত্মা পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদান)-এর মধ্যে ভাসমান থাকে। আত্মার অবস্থান হৃদয়ের মধ্যে, এবং দেহধারী জীবগণের সমগ্র শরীরে তার প্রভাব বিস্তার করে। যখন পঞ্চবায়ুর দূষণ থেকে

আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে, তখন তার চিন্ময় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।" এইভাবেই জীবের অগণিত প্রজাতির মধ্যে চিন্ময় আত্মা প্রাণবায়ুর মধ্যে অবস্থান করে।

শ্লোক ৪০

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্মজানি ।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ৪০ ॥

যর্হি—যখন; **অব্জ-নাভ**—পরমেশ্বর ভগবানের, যাঁর নাভি পদ্মফুলের মতো; **চরণ**—চরণ; **এষণয়া**—শুধুমাত্র বাসনার ফলে; **উরু-ভক্ত্যা**—সবিশেষ ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে; **চেতঃ**—হৃদয়ের; **মলানি**—মলিনতা; **বিধমেৎ**—বিধৌত হয়; **গুণ-কর্ম-জানি**—প্রকৃতির গুণাবলী মাধ্যমে উৎপন্ন এবং সেই সকল গুণানুসারে জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **বিশুদ্ধে**—(হৃদয়) সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়ে; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধি করা যায়; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মার যথার্থ প্রকৃতি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যথা**—যেভাবে; **অমল-দৃশোঃ**—শুদ্ধ দৃষ্টির; **সবিতৃ**—সূর্যের; **প্রকাশঃ**—প্রকাশ।

অনুবাদ

যখন মানুষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে তার হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল চিন্তায় মনোনিবেশ করে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তখন জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তার অন্তরে পূর্বকৃত ফলাশ্রয়ী কর্মের পরিণাম স্বরূপ সঞ্চিত অসংখ্য অশুদ্ধ বাসনাদি সে বিনষ্ট করতে পারে। যখন এইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং নিজের স্বরূপকে দিব্য সত্তা রূপে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবেই মানুষ যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্ময় দিব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সার্থক সাফল্য অর্জন করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি যখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনও সুখে নিদ্রা উপভোগের অভিজ্ঞতা স্মরণের মাধ্যমেও মানুষ নিত্যস্থিত, অপরিবর্তনশীল আত্মার প্রাথমিক সামান্য দর্শন লাভ করতেও পারে। কেউ প্রশ্ন

করতে পারে, যদি গভীর নিদ্রার মধ্যে আত্মার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তা হলে কেন জাগ্রত হলে মানুষ মায়াময় জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে ফিরে আসে? উত্তরে বলা যায় যে, অন্তরে জড়জাগতিক বাসনাদি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার ফলে, বদ্ধ জীবাত্মা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অজ্ঞনেতায় আসক্ত হয়ে থাকে। কারাকক্ষের জানালার বাইরে গরাদের মধ্যে দিয়ে বন্দী মুক্ত আলোক কিছুটা দেখতে পারে, কিন্তু তবুও সে কারাবন্দী থেকেই যায়। তেমনই, যদিও বদ্ধ জীবাত্মা চিন্ময় আত্মার ক্ষণিক দর্শন লাভ করতেও পারে, তবুও তাকে জাগতিক জড় কামনা-বাসনার বন্ধনে বন্দী হয়ে থাকতেই হয়। অতএব, যদিও অনিত্য অস্থায়ী শরীরটির মধ্যে যে নিত্য স্বরূপ আত্মা অবস্থান করে, তার প্রারম্ভিক উপলব্ধি মানুষ অর্জন করতে পারলেও, কিংবা অন্তরমাঝে বিশেষ আত্মাটির সঙ্গে যে পরমাত্মার অবস্থান, তার উপলব্ধি হলেও, জড়জাগতিক কামনা-বাসনা নামে অভিহিত জাগতিক অস্তিত্বের কারণ দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে এক অতি বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েই থাকে।

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময়ে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" মৃত্যুকালে মানুষের বাসনা-অভিলাষ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জীবকে যথাযথ জড়জাগতিক শরীর প্রদান করা হয়ে থাকে। *কর্মণা দৈবনেত্রেন জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।* মানুষের মনে ফলাশ্রয়ী কামনা-বাসনা এবং ক্রিয়াকলাপ অনুসারে এবং দেবতাদি নামে অভিহিত শ্রীভগবানের প্রতিভূগণের আয়ত্তাধীন ব্যবস্থাক্রমে, জীবকে এমন একটি বিশেষ ধরনের জাগতিক শরীর প্রদান করা হয়ে থাকে, যা অবধারিতভাবেই জন্ম, মৃত্যু, জরা, এবং ব্যাধির দ্বারা বিব্রত হওয়ার পরিণাম ভোগ করে। যদি কেউ বিশেষ কারণ-রহস্যটি দুর করতে পারে, তা হলে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সে কর্মের ফলও নস্যাৎ করে দিতে পারে। অতএব, এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় লাভের যোগ্যতা অর্জনেরই অভিলাষ পোষণ করা মানুষের উচিত। জড়জাগতিক সমাজ প্রতিপত্তি, সখ্যতা এবং স্নেহ-ভালবাসার মায়াময় বাসনা মানুষের বর্জন করা উচিত, যেহেতু ঐ ধরনের বাসনাদি ক্রমশ জাগতিক বন্ধন সৃষ্টি করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই মনোনিবেশ করা মানুষের উচিত, যাতে মৃত্যুকালে অবধারিতভাবে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ হতে পারে। তাই ভগবান বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয় ॥

"মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" (গীতা ৮/৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের যথার্থ 'আশ্রয়। আর মানুষের অন্তর যত শীঘ্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, ততই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

ভগবদ্গীতায় বিবৃত *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্* শব্দগুলির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বিশেষবাদীরা নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা বৃথাই এই শব্দগুলিকে *ব্রহ্মসাযুজ্যম্*, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাথে নিরাকার ব্রহ্মরূপে বিলীন হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি বলে কখনও ব্যাখা করে থাকে। পরিষ্কারভাবে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের *অব্জনাভ* অর্থাৎ পদ্মফুলের মতো নাভিরূপ শরীরের চরণকমলে মানুষকে অবশ্যই মন ও ভক্তি নিবদ্ধ করতে হবে। যদি প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বর ভগবানের সমান হত, তা হলে তো জীব শুধুমাত্র নিজের কথা চিন্তা করার মাধ্যমেই শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা মতভেদ সৃষ্টি হত—পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে শুদ্ধ হয়ে উঠার কোনই প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তাঁকে *ভগবদ্গীতায় পবিত্রং পরমম্* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি পরম শুদ্ধ। সুতরাং, বৈদিক শাস্ত্রের বিবৃতি থেকে একটা নির্বিশেষবাদী অর্থ কৃত্রিমভাবে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা অনুচিত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের যথার্থ পর্যায়ে অনুশীলন করতে হলে মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের মতো কার্যকলাপ অনুসরণ করা যেতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ধ্রুব মহারাজ এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার মানসে জড়জাগতিক পর্যায়ে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যখন শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করার ফলে (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*), তিনি জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের আর কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে উল্লিখিত *জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যম্* শ্লোকাংশ অনুসারে, মানুষ যখনই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন থেকেই সে অনাবশ্যক জাগতিক কামনা-বাসনার বিরক্তি থেকে আসক্তিশূন্য হতে থাকে।

উপলভ্যাত *আত্মতত্ত্বম্* শব্দগুলি এই শ্লোকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *আত্মতত্ত্বম্* অর্থাৎ আত্মা বিষয়ক জ্ঞান বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ অংশ প্রকাশ যথা নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি এবং তাঁর আপন তটস্থ জীবসত্তা সব কিছুরই তত্ত্ব বোঝায়। এখানে *সাক্ষাৎ* শব্দটির মাধ্যমে তাই বোঝানো হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির মানসে শ্রীভগবানের স্বরূপ বিশেষত্ব, তাঁর হাত এবং পা, তাঁর বিবিধ দিব্য যান এবং সেবকবৃন্দ, এবং আরও অনেক কিছু জানতে হয়, ঠিক যেভাবে সূর্যদেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে হলে, মানুষ ক্রমশ সূর্যের শরীর, তাঁর দিব্য রথ এবং পরিচারকদেরও জানতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নির্দেশ করেছেন যে, ৩৫ থেকে ৩৯ সংখ্যক শ্লোকাবলীতে সাধারণ যুক্তিবাদের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্লোক ৩৫ *বিষয়* অর্থাৎ সাধারণ বিবেচ্য তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে। শ্লোক ৩৬ *সমস্যা* অর্থাৎ সন্দেহ বিষয়ক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে। শ্লোক ৩৭ *পূর্বপক্ষ* অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতবাদ উপস্থাপন করেছে। আর শ্লোক ৩৮ সুনির্দিষ্টভাবে *সিদ্ধান্ত* অর্থাৎ উপসংহার প্রতিপন্ন করেছে। শ্লোক ৩৯ *সঙ্গতি* অর্থাৎ সারমর্ম উপস্থাপন করেছে। *সঙ্গতি* অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে, শ্রীভগবানের চরণকমলে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে বন্দনা করতে হবে। এইভাবে, মানুষের চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত করার মাধ্যমে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করা যায়, ঠিক যেমন সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত ২০/২০ দৃষ্টিশক্তিতে সহজেই সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি দেখতে পায় কিংবা যেমন সূর্যের কোনও উত্তম ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং সূর্যদেবের দিব্য অঙ্গ দর্শন করতে পারে।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কর্ম-যোগম্**—পরমেশ্বরের সাথে কর্মসাধনার যোগসূত্র স্থাপন; **বদত**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **যেন**—যার দ্বারা; **সংস্কৃতঃ**—সংস্কার সাধিত হয়ে; **বিধূয়**—মুক্তি লাভ করে; **ইহ**—এই জীবনে; **আশু**—শীঘ্রই; **কর্মাণি**—জাগতিক কর্ম; **নৈষ্কর্ম্যম্**—ফলাশ্রয়ী কর্মফল থেকে মুক্তি; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **পরম্**—দিব্য।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—হে মহামুনিগণ, কৃপা করে কর্মযোগের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া ইহজীবনের সকল কাজকর্ম পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তার ফলে মানুষ দিব্যস্তরে শুদ্ধজীবন উপভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে (৩/৫)—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

"সকলেই অসহায়ভাবে মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।" যেহেতু কোনও জীব নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে পারে না, সেই জন্যই তাকে সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা অবশ্যই শিখতে হবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—"দেহমধ্যে দেহী নিয়ে সমস্যা নয়, কিন্তু আত্মার প্রকৃতিই হল সর্বদা কর্মচঞ্চলতা। কর্তব্যকর্ম না করে কেউ স্থির থাকতে পারে না। চিন্ময় আত্মা না থাকলে সেই সকল কর্তব্যকর্ম কেউ করতে পারে না। আত্মা না থাকলে শরীর কর্মক্ষম হতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে শরীর নিতান্তই নিষ্প্রাণ আধার মাত্র, যাকে চিন্ময় আত্মা সজীব রাখে, সেই আত্মা সকল সময়ে কর্মচঞ্চল এবং এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। তাই, চিন্ময় আত্মাকে কৃষ্ণভাবনাময় সৎ কাজে নিয়োগ করতে হয়, তা না হলে মায়াময় শক্তির নির্দেশে বিভিন্ন কাজে সেই আত্মা নিয়োজিত হবে। জাগতিক শক্তির প্রভাবে, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক গুণাবলী আহরণ করে এবং সেই ধরনের কলুষতা থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করতে হলে শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্ধারিত কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। কিন্তু আত্মা যদি কৃষ্ণভাবনাময় স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হয়, তাহলে মানুষ যা কিছু করে তা সবই তার পক্ষে কল্যাণকর হয়ে উঠে।"

সাধারণ মানুষেরা প্রায়ই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তমণ্ডলীর কর্মব্যস্ত জীবনধারার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, যেহেতু ঐসকল ক্রিয়াকর্ম তাদের কাছে সাধারণ জড়জাগতিক কাজ বলেই মনে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, *কাম্যকর্মাণ্যেব ত্যাজিতানি, ন তু নিত্যনৈমিত্তিকানি ফলস্যৈব বিনিন্দিতত্বাৎ।* নিজ ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্ম বর্জন করা উচিত, যেহেতু

ঐ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের পরিণামে ক্রমশ আরও জাগতিক বন্ধনদশা সৃষ্টি হতে থাকে। তাই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই মানুষের সমস্ত দৈনন্দিন তথা বৃত্তিমূলক কর্তব্যকর্ম সবই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হয়, এবং তার ফলে ঐ সকল কাজকর্ম দিব্য ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকার্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—এই শব্দসমষ্টির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভগবদ্-সেবায় নিজ কাজকর্ম সন্নিবিষ্ট করা এমন এক প্রকার দক্ষতাপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম, যা পারমার্থিক সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে শিখতে হয়। নতুবা যদি কেউ তার নিজ খেয়ালখুশি মতো তার সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকল্যাপকে দিব্য ভগবদ্ সেবা বলে জাহির করতে চায়, তা হলে যথাযথ ফললাভ হবে না। তাই, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, মানুষ যেন *নৈষ্কর্ম্যম্* শব্দটির দ্বারা নিষ্কর্মা হয়ে কাজকর্ম বর্জন করে বসে থাকার পরামর্শ না বোঝে; বরং এর দ্বারা বোঝায় যে, শ্রীভগবান এবং তাঁর যোগ্য প্রতিভূর পরামর্শ ও নির্দেশানুযায়ী দিব্যভাবময় কাজকর্মই করতে হবে।

শ্লোক ৪২

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে ।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **ঋষীন্**—ঋষিবর্গকে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অপৃচ্ছম্**—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম; **পিতুঃ**—আমার পিতা (ইক্ষ্বাকু মহারাজ); **অন্তিকে**—সামনে; **ন অব্রুবন্**—তাঁরা বলেননি; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **তত্র**—তার; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতাম্**—কৃপা করে বলুন।

অনুবাদ

অতীতকালে আমার পিতা ইক্ষ্বাকু মহারাজার সমক্ষে ব্রহ্মার চারপুত্র মহর্ষিবর্গের কাছে এমনই এক প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছিলাম। তবে তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কৃপা করে আপনি তার কারণ বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ*, "ব্রহ্মার পুত্রগণ" বলতে শ্রীসনক ঋষি প্রমুখ চতুষ্কুমারগণকে বোঝায়। শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্রভাগবত* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যাতে শ্রীব্রহ্মার চার পুত্র মহাজন হলেও এবং তাঁরা ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক পারমার্থিক বিজ্ঞানের বিশারদ হলেও, নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত ছিলেন, তার কারণ ছিল এই যে, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করতে ইচ্ছা

করেছিলেন যে, কল্পনাভিত্তিক মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানচর্চায় যারা পারদর্শী, তারা ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে যথার্থ উপলব্ধি লাভ করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সনকাদি ঋষিবর্গ যে রাজার প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত হয়েছিলেন, তার কারণ সেই সময়ে নিমিরাজ ছিলেন এক তরুণ বালক মাত্র এবং সেই কারণেই পরিপূর্ণভাবে সেই উত্তর উপলব্ধির যথার্থ সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

শ্লোক ৪৩

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ

কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীআবির্হোত্রঃ উবাচ—ঋষি শ্রীআবির্হোত্র বললেন; **কর্ম**—শাস্ত্র-নির্দেশিত কর্তব্যকর্ম প্রতিপালন; **অকর্ম**—যথাযথ কর্তব্যপালনে ব্যর্থতা; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কাজকর্মে লিপ্ত থাকা; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ-বাদঃ**—বেদ শাস্ত্রাদির মাধ্যমে উপলব্ধ বিষয়াদি; **ন**—না; **লৌকিকঃ**—জড়জাগতিক; **বেদস্য**—বেদগ্রন্থাবলীর; **চ**—এবং; **ঈশ্বর-আত্মত্বাৎ**—স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত; **তত্র**—এই বিষয়ে; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়ে; **সূরয়ঃ**—(এমন কি) মহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও।

অনুবাদ

শ্রীআবির্হোত্র উত্তর দিলেন—নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালন এবং সেই বিষয়ে ব্যর্থতা ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে প্রামাণ্য পাঠ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যথাযথভাবে সবকিছু জানতে পারে। কোনও প্রকার জাগতিক কল্পনার মাধ্যমে এই দুরূহ তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানেরই বাণী-অবতার স্বরূপ, এবং সেই কারণেই বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত। মহা বিদ্বান পণ্ডিতেরাও বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা অবহেলা করলে কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দিব্য শাস্ত্রাদির মাধ্যমে অনুমোদিত যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের নাম *কর্ম*, আর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতার নাম *অকর্ম*। নিষিদ্ধ কাজকর্ম সম্পাদনের নাম *বিকর্ম*। এইভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা-অনুসারে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম নির্ধারিত হয়েছে। নিতান্ত জাগতিক যুক্তিবাদের অনুশীলন করার

মাধ্যমে ঐ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৬/৫১) শ্রীভগবান বলেছেন, *শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মামোভে শাশ্বতী তনু*—"ওঁ-কার এবং হরে কৃষ্ণ হরে রাম শব্দগুলির মতো ধ্বনিরূপে বৈদিক দিব্য ভাব তরঙ্গেরই প্রতিরূপ আমি। আমার এই দুটি রূপ—যথা, দিব্য বৈদিক শব্দবাণী এবং সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ—আমার নিত্য রূপ; সেইগুলি জাগতিক নয়।" তেমনই *ভাগবতে* (৬/১/৪০) বলা হয়েছে—*বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম*—"বেদশাস্ত্রাদি সাক্ষাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণ এবং তা স্বয়ংসৃষ্ট সত্তা। আমরা যমরাজের কাছে তা শুনেছি।" *পুরুষ-সূক্ত* (*ঋগ্বেদ*, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৯ম মন্ত্র) উল্লেখ করেছে যে, *তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে / ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ*—"যজ্ঞ, তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত বৈদিক উৎসর্গ মন্ত্রাবলী, মঙ্গলাচরণ এবং স্তুতিবন্দনা প্রাপ্ত হয়েছে। বেদশাস্ত্রাদির সমস্ত মন্ত্রাবলী শ্রীভগবানের কাছ থেকেই লব্ধ হয়েছে।" পরমেশ্বর ভগবানের সকল অবতার রূপ পরিগ্রহ সম্পূর্ণভাবেই দিব্য অপ্রাকৃত এবং দোষত্রুটি, ভ্রমভ্রান্তি, ছলচাতুরি ও ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় উপলব্ধি জনিত বদ্ধজীবের এই চার প্রকার অপূর্ণতা দোষ থেকে মুক্ত। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানেরই দিব্য অংশপ্রকাশরূপে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারও সেই প্রকারে অভ্রান্ত এবং দিব্য সত্য।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পার্থিব জগতে কোনও বিশেষ শব্দের মাধ্যমে তার লক্ষ্য বিষয়বস্তুটির বর্ণনার পরেই তা বর্জিত হয়। বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত দিব্যধামে কোনও কিছুই বর্জিত হয় না, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য শব্দ রূপে তাঁর স্বরূপে *শব্দব্রহ্ম* নামে অভিহিত হয়ে বিরাজমান রয়েছেন।

মানুষের সাধারণ আলোচনা প্রসঙ্গে, বক্তার অভিলাষ উপলব্ধির মাধ্যমে মানবিক শব্দের অর্থ নিরূপণ করা যায়। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান যেহেতু *অপৌরুষেয়*, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, তাই শুধুমাত্র গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রামাণ্য সূত্রের মাধ্যমে শ্রবণের ফলেই তাই তার তাৎপর্য মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই পদ্ধতি স্বয়ং শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্*) অনুমোদন করেছেন। তাই, সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিরা গর্বভরে এই সহজ সাধারণ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রম অস্বীকার করেন বলেই বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের পরম তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে হতাশ প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করে থাকেন। শ্রীব্রহ্মার চতুঃসন্তানাদি নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত হয়েছিলেন যেহেতু তখন রাজা নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রবণের পদ্ধতিগ্রহণে তিনি যথার্থ আত্ম নিবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষম ছিলেন। শ্রীল মধ্বাচার্য এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ঈশ্বরাত্মত্বাদ্ ঈশ্বরবিষয়ত্বাৎ।*

যেহেতু বেদশাস্ত্রাবলীতে অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের বর্ণনা রয়েছে, তাই জাগতিক উপলব্ধির পদ্ধতি অনুসারে তা বুঝতে পারা যায় না।

শ্লোক ৪৪

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্ ।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ৪৪ ॥

পরোক্ষ-বাদঃ—কোনও পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা গোপনের উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে বর্ণনা; **বেদঃ**—বেদশাস্ত্র; **অয়ম্**—এই সকল; **বালানাম্**—বালসুলভ ব্যক্তিদের; **অনুশাসনম্**—পথ নির্দেশ; **কর্ম-মোক্ষায়**—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্তি; **কর্মাণি**—জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **বিধত্তে**—বিধান; **হি**—অবশ্যই; **অগদম্**—ঔষধ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শিশুসুলভ এবং মূর্খ মানুষেরা জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই আসক্ত হয়ে থাকে, যদিও ঐ ধরনের সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। সুতরাং, বৈদিক অনুশাসনাদি পরোক্ষভাবে প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণের বিধান দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টদ্রব্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শিশুকে ঔষধ গ্রহণে আগ্রহান্বিত করে তোলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* আপাতদৃষ্টিতে বেদশাস্ত্রাদি জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের পরিবেশের মাধ্যমেই ফলাশ্রয়ী কর্মফল আহরণের পথ দেখায়। যারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ভাবধারায় ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি বা কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে স্বর্গলোক নামে উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। *অশ্নতি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।* তেমনই, যারা কর্মকাণ্ড অর্থাৎ রজোগুণাশ্রিত ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণ করে থাকে, তারা পৃথিবীতে মহান শাসক কিংবা ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠার সৌভাগ্য লাভ করে এবং বিপুল সম্মান-সৌভাগ্য ও জাগতিক শক্তি অর্জন করার সুযোগ পায়। তবে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—*প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা*—"যদিও বদ্ধ জীবগণের মধ্যে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণ করবার প্রবৃত্তিই বেশি জনপ্রিয়, কিন্তু মানুষ যখন সমস্ত প্রকার ফলাশ্রয়ী প্রচেষ্টা বর্জন করে, তখনই তার জীবনে যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়ে থাকে।"

কোনও পিতা যদি তাঁর পুত্রসন্তানকে বলেন, "আমার কথামতো এই ওষুধগুলি তোমাকে খেতেই হবে, "তা হলে সন্তান ভয় পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে সেই ওষুধ বরবাদ করতে পারে। তাই, পিতা তাঁর শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেন, "তোমাকে আমি একটা চমৎকার লজেন্স এনে দিচ্ছি। তবে লজেন্স খেতে যদি চাও, তা হলে আগে এই ওষুধটুকু খেয়ে নাও তো, আর তা হলেই লজেন্সটা পেয়ে যাবে।" ঐ ধরনের প্রলোভনকে বলা হয় *পরোক্ষবাদঃ*, অর্থাৎ যথার্থ উদ্দেশ্যটিকে অন্যভাবে বর্ণনার মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়। সন্তানের কাছে পিতা প্রস্তাব রাখলেন যেন প্রধান লক্ষ্যটি লজেন্স পাওয়া এবং সেই লক্ষ্যটি পূরণের জন্য অতি সামান্য একটি শর্ত পালন করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, অবশ্যই পিতার লক্ষ্য শিশুটিকে ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তোলা। তাই, প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিকে অন্যভাবে বর্ণনা করে এবং অন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যটিকে আচ্ছন্ন করে রাখার পদ্ধতিকে বলা হয় *পরোক্ষবাদঃ* অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সম্মত করানো।

যেহেতু বদ্ধজীবগণ অধিকাংশই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভে আসক্ত থাকে (*প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্*), সেই কারণেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নির্ধারিত কর্তব্যকর্মগুলি তাদের সামনে এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অবতারণা করে থাকে, যার ফলে তারা স্বর্গলাভে কিংবা পৃথিবীতে শক্তিমান শাসন কর্তৃত্বের মর্যাদা লাভের মতো ফলাশ্রয়ী বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল প্রাপ্তির বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সম্মত কর্মকাণ্ডে শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হয়ে থাকেন, এবং ঐভাবেই মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে যে, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের যথার্থ স্বার্থের অনুকূল। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*। এই ধরনের পরোক্ষ পদ্ধতি *বালানাম্* অর্থাৎ বালসুলভ তথা নির্বোধ মানুষদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ অচিরেই প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে শ্রীভগবান স্বয়ং কি উদ্দেশ্যে কোন্ বিধান নির্দিষ্ট করেছেন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*)। পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করাই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ঐভাবে আশ্রয় গ্রহণ না করলে, জীবকে শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তির কবলে পড়ে ৮৪,০০,০০০ প্রজন্মের মধ্যে অবশ্যই আবর্তিত হতে হবে। স্থূল ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম উপলব্ধির মাধ্যমে সাধারণ জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে সর্বদাই মায়াময় জাগতিক উপভোগের উদ্দেশ্যে বাসনার মাধ্যমে বিকৃত অসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, নিরাকার

নির্বিশেষবাদী আত্ম উপলব্ধির অনুশীলনও বদ্ধ জীবের পক্ষে উৎপাত সৃষ্টি করে থাকে, যেহেতু নির্বিশেষবাদী কল্পনার পদ্ধতি নিতান্তই সম্পূর্ণভাবে শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার কৃত্রিম প্রচেষ্টা মাত্র। ঐ ধরনের প্রচেষ্টা কোনওভাবেই বেদশাস্ত্রাদির যথার্থ বিচার পদ্ধতির অনুকূল নয়, যা *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*)।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে ফলাশ্রয়ী জাগতিক লক্ষ্য পরিপূরণের অভিমুখে এগিয়ে চলার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং ক্রমশ যথার্থ জ্ঞানের অভিমুখেই আকৃষ্ট হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

> *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।*
> *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

কলিযুগে আয়ু খুবই অল্প হয় (*প্রায়েণাল্পায়ুষঃ*), এবং মানুষ সাধারণত বিশৃঙ্খল (*মন্দাঃ*), বিপথগামী (*সুমন্দমতয়ঃ*), এবং তাদের পূর্বকর্মের অশুভ কর্মফলে বিপুলভাবে ভরাক্রান্ত (*মন্দভাগ্যঃ*) হয়ে থাকে। তাই তাদের মনে কখনই শান্তি থাকে না (*উপদ্রুতাঃ*), এবং তাদের অতি স্বল্প আয়ুষ্কালে বৈদিক শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকর্মসাধনের পথে ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দেয়। অতএব, এমতাবস্থায় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ অভ্যাস করাই একমাত্র আশাভরসা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) রয়েছে—

> *কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।*
> *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥*

কলিযুগ শঠতা ও কলুষতার সমুদ্র। কলিযুগে সকল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপাদান যথা—জল, মাটি, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহম্‌বোধ—সবই কলুষিত হয়ে যায়। এই পতনোন্মুখ যুগে একমাত্র শুভ বিষয়—শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তনের পদ্ধতি (*অস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ*)। শুধুমাত্র মহানন্দময় পদ্ধতিতে কৃষ্ণকীর্তনেই মানুষ এই কলুষিত যুগের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে যায় (*মুক্ত সঙ্গ*) এবং ভগবদ্ধামে, নিজ নিকেতনে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাবর্তন করতে পারে (*পরং ব্রজেৎ*)। অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের প্রচারক মণ্ডলীও পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য সুন্দর দিব্য সুস্বাদু মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে বদ্ধজীবগণকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *কেবল আনন্দকাণ্ড*, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরমানন্দময়। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষভাবে আকৃষ্ট মানুষও অচিরে জীবনে সার্থকতা অর্জন করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে, নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৪৫

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

ন আচরেৎ—আচরণ করে না; **যঃ**—যে; **তু**—তবে; **বেদ-উক্তম্**—বেদশাস্ত্রে উক্ত; **স্বয়ম্**—নিজে; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—নিজ ইন্দ্রিয়াদি সংযমে অনভ্যস্ত; **বিকর্মণা**—শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য পালন না করে; **হি**—অবশ্য; **অধর্মেণ**—তার অধর্মোচিত আচরণে; **মৃত্যোঃ মৃত্যুম্**—মৃত্যুর পরে মৃত্যু; **উপৈতি**—লাভ করে; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যদি কোনও অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ মানুষ বৈদিক অনুশাসনগুলি পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে পাপকর্ম এবং অধর্মোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। এইভাবেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়াই তার পরিণাম হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বেদশাস্ত্রাদিতে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হলেও, সকল প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মানব জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। অতএব, লোকে মনে করতে পারে যে, বৈদিক রীতিনীতির মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে বলেই সেইগুলি অনুধাবনের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ অন্য ভাবে বলতে গেলে যেব্যক্তি জানে না যে, জাগতিক দেহটাই তার সত্তা নয়, বরং সে একটি নিত্য শাশ্বত চিন্ময় আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে অবধারিতভাবেই জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হবে। সুতরাং, যদি ঐ ধরনের কোনও মানুষ জাগতিক সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে যে সব বৈদিক অনুশাসনাদি ইন্দ্রিয় উপভোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযোজ্য, সেগুলি অবহেলা করে, তা হলে অবশ্যই সে পাপময় জীবনে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। যেমন, মৈথুনাসক্ত মানুষদের বিবাহযজ্ঞ তথা ধর্মমতে বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করি যে, ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত অনেক বৈদিক জ্ঞান অনুযায়ী তরুণ শিক্ষার্থীরাও বিবাহ উৎসবকে মায়াময় কার্যকলাপ মনে করে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কিন্তু ঐ ধরনের ব্রহ্মচারী

তরুণ যদি তার ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখতে না পারে, তবে অবধারিতভাবেই তাকে পরিণামে অবৈধ মৈথুন চর্চায় পতনোন্মুখ হতে হবে, যা বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী কাজ। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে কনিষ্ঠ তথা নবীন ভক্তকে আকণ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদ সেবনে উৎসাহিত করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভক্তিযোগের অনভিজ্ঞ অনুশীলনকারী ভক্ত প্রচুর পরিমাণে আকণ্ঠ ভোজনের কৃতিত্ব প্রদর্শনে উৎসাহী হতে পারে এবং তার পরিণামে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের অভ্যাসে লিপ্ত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি* শব্দটির অর্থ এই যে, পাপকর্মে অভ্যস্ত মানুষকে মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ স্বয়ং নরকবাসের অনায়াস ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন। এই বিষয়টি বেদশাস্ত্রেও এইভাবে বর্ণনা করা আছে—*মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্মভিঃ*। "জাগতিক নিজ কর্মফলে যে সকল মানুষ বিষম কষ্ট ভোগ করে, তারা মৃত্যুকালে কোনও নিষ্কৃতি পায় না, কারণ তাদের আবার এমনই এক পরিবেশে রাখা হয়, যেখানে মৃত্যুকালে সে কোনও সান্ত্বনা পায় না।" অতএব, বিবাহ উৎসব কিংবা প্রচুর *যজ্ঞশিষ্ট* তথা যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎ-প্রসাদ আস্বাদনের অভ্যাস বর্জন করা তাদের পক্ষে অনুচিত, যাদের ইন্দ্রিয়াদি এখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি।

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিশুসন্তানকে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য পিতার পক্ষে মিষ্টান্ন খাওয়ানোর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মিষ্টান্নের দরকার নেই মনে করে শিশু যদি পিতার কথা অমান্য করে, তাহলে ব্যাধি প্রশমনের জন্য উপযোগী ওষুধটির সুযোগ গ্রহণে শিশুটিও বঞ্চিত হয়ে থাকবে। সেইভাবেই, সব বৈদিক অনুশাসনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে. যদি কোনও জাগতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তা প্রত্যাখান করে, তা হলে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে না, বরং তার পরিবর্তে সে আরও অধোগামী হবে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষের মন ও বুদ্ধি যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী-উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গমে আন্তরিকভাবে নিবদ্ধ থাকে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্পর্কে অর্জুনের মতো বদ্ধ জীবদের ভাবধারার মনোরম তাৎপর্য দিয়েছেন। এই সকল নির্দেশাবলী অনুধাবনে যে মনোনিবেশ করতে না পারে, তাকে জাগতিক মানুষ বলে গণ্য করতে হবে, কারণ ঐ ধরনের মানুষ পাপময় কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং তাদেরই যথাযথ বৈদিক অনুশাসনাদি প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। ঐ ধরনের বৈদিক নির্দেশাবলী কর্মফলাশ্রয়ী হলেও সেগুলি পুণ্যকর্ম রূপে স্বীকৃত হয়, তা শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন এবং তাই ঐগুলি যথাযথভাবে পালন

করলে নরকবাসে অব্যাহতি মেলে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

"জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা থেকে যথাযথভাবে নিরাসক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি বিশ্বাস নিয়ে নামজপকীর্তনে অভ্যস্ত না হওয়া অবধি, বৈদিক ধর্মাচরণ প্রতিপালন করা উচিত।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে, স্নান সেরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয়। যদি কেউ অবহেলাভরে এই ধরনের সুচারু সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা বর্জন করে, তা হলে ক্রমশই তাকে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগমূলক ক্রিয়াকর্ম যথা, যত্রতত্র দোকানে বাজারে নির্বিচারে আহারাদি গ্রহণ এবং অবৈধ নারী সংসর্গে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এইভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়াদির সংযম হারিয়ে, পশুর মতো হয়ে গিয়ে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিয়াকর্মে মেতে উঠে। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন, *অজ্ঞঃ সমাচরন্নপি*। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবনযাপন করলেও মানুষ তার কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বিবেচনা করে না। মানুষের কাজকর্মের ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে এই ধরনের নির্লিপ্ত মনোভাবের ব্যাখ্যা করে *ভগবদ্গীতায়* তাকে অজ্ঞানতার লক্ষণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান মানুষ যদি জানে যে, দূরপাল্লার অতি দ্রুতগামী যান চলাচলের উপযোগী বড় রাস্তায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক, তা হলে সচরাচর সেখানে সে গাড়ি চালাতে যাবে না, তেমনই বুদ্ধিমান মানুষ যদি জানে যে, বেদবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হলে এখানে উল্লেখিত *মৃত্যোর্মৃত্যুম্ উপৈতি* বাণীর মাধ্যমে বর্ণিত মহা দুর্বিপাকের চরম প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তা হলে সে তেমন বিপজ্জনক পরিণতির কাজের অভ্যাস থেকে বিরত থাকতেই সচেষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, অজ্ঞ লোকেরা অনেক সময়ে মনে করে যে, মৃত্যুর পরে আপনা হতেই চির শান্তি লাভ করবে। কিন্তু পাপময় কাজকর্মের ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হয়, কারণ জড়জাগতিক কাজকর্মের অতি সামান্য এবং অস্থায়ীফল লাভের বিনিময়ে তাকে অবশ্যই নারকীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতেই হয়। মানুষ যতদিন বৈদিক অনুশাসনাদির প্রতি অবহেলা পোষণ করতে থাকে, ততদিন যাবৎ ঐ ধরনের যাবতীয় নারকীয় প্রতিক্রিয়া একবার নয়, বারে বারে সংঘটিত হতেই থাকে।

শ্লোক ৪৬

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে ।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতি ॥ ৪৬ ॥

বেদ-উক্তম্—বেদশাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত বিধিবদ্ধ ক্রিয়াকর্ম; **এব**—অবশ্যই; **কুর্বাণঃ**—সম্পন্ন করে; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তিশূন্য হয়ে; **অর্পিতম্**—অর্পণ করে; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—জড়জাগতিক কাজকর্ম ও তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি; **লভতে**—লাভ; **সিদ্ধিম্**—সার্থকতা; **রোচন-অর্থা**—উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে; **ফলশ্রুতিঃ**—বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত জড়জাগতিক কর্মফলের প্রতিশ্রুতি।

অনুবাদ

নিরাসক্তভাবে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কাজকর্ম সম্পন্ন করে, তার ফলাফল পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সার্থকতা অর্জন করে। দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বৈদিক জ্ঞানসম্পদের যথার্থ লক্ষ্য নয়, বরং সেইগুলির মাধ্যমে কর্মরত মানুষের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাথে বদ্ধজীব যাতে তার নিত্যকালের সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাকে মানবজীবন লাভের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, জীবনধারায় মানবদেহ অর্জন করা সত্ত্বেও অধিকাংশ জীবই আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন উপভোগের মতো পশুসুলভ কাজকর্মের ধারা উন্নতিকল্পে আসক্ত হয়েই থাকে। প্রায় কেউই জীবনের যথার্থ স্বার্থকতাস্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহ বোধ করে না।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজেন্দ্র, যে সকল মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে নিবিষ্ট হয়ে থাকার ফলে পরমতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানদর্শনে অন্ধ হয়ে থাকে, তারা মানব সমাজের মাঝে নানা বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়।" (*ভাগবত* ২/১/২)

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পরমকারুণিকো বেদঃ*—"বৈদিক জ্ঞানসম্পদ পরম করুণাসম্পদে পরিপূর্ণ"—কারণ তার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভাবনাসম্পদের অনুশীলন প্রক্রিয়া ক্রমশ পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে প্রভাবিত এবং

পরিশুদ্ধ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। অধিকাংশ মানুষই অকস্মাৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হয় না, যদিও বৈদিক সাহিত্যসম্ভার থেকে তারা বুঝতেই পারে যে, ঐ ধরনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভ্যাস থেকে ভবিষ্যতে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সরকার থেকে যখন দেশবাসীকে জানানো হল, ধূমপান করলে হৃৎপিণ্ডে ক্যানসার রোগ হয়, তখনও অধিকাংশ মানুষই তাদের ধূমপানের বদভ্যাস ছাড়তে পারেনি। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধতা অর্জনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে বদ্ধ জীব তার জাগতিক কাজকর্মের ফল পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে শেখে এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেই সকল কাজ চিন্ময় ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ সাধিত হয়ে থাকে দুটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা এবং মৈথুন জীবন উপভোগের জন্য যৌনাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে সুস্বাদু আহার্যাদি নিবেদনের মাধ্যমে এবং তারপরে সেই সকল আহার্যাদির অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণপ্রসাদ রূপে সেবনের ফলে, এবং বৈদিক গৃহস্থের বিধিনিয়মাদি পালনের মাধ্যমে এবং কৃষ্ণভাবনাময় সন্তানাদি লাভের দ্বারা মানুষ ক্রমান্বয়ে জাগতিক কার্যকলাপের সবকিছুই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পারে। মানুষ তার সাধারণ কাজকর্মেরও ফল পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার মাধ্যমে ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে যে, জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়—স্বয়ং শ্রীভগবানই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* মধ্যে সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ যদি অপরিণত পর্যায়ে গৃহস্থ জীবন বর্জন করতে উৎসাহী হয় কিংবা শ্রীভগবানের পরম উপাদেয় প্রসাদ গ্রহণে বিমুখ হয়, তা হলে সেই ধরনের বৈরাগ্যের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

কিছু দ্বিরাচারী মানুষ আছে, যারা বেদশাস্ত্রাদির অপ্রাকৃত দিব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে এবং অযথা অভিমত ব্যক্ত করে থাকে যে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞাদির মাধ্যমে যে সকল জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফল আহুতি স্বরূপ অর্পণ করা হয়ে থাকে, সেইগুলিই বেদশাস্ত্রাদির চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সেই ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।" (*গীতা* ২/৪২-৪৩) বৈদিক শাস্ত্রাদির উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত ঐ ধরনের নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ এই শ্লোকটিতে *নিঃসঙ্গ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ জাগতিক ফললাভে আকৃষ্ট না হয়ে। বেদশাস্ত্রাদির যথার্থ উদ্দেশ্য *অর্পিতম্ ঈশ্বরে,* সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে। তার পরিণামে *সিদ্ধিম্* অর্থাৎ জীবনের পরম সার্থকতা ও সিদ্ধিলাভ স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা সম্ভব হবে।

রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ শব্দসমষ্টি সুস্পষ্টভাবেই বোঝায় যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল ফলাশ্রয়ী কার্যের পরিণাম নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলির দ্বারা বৈদিক অনুশাসনাদির প্রতি জাগতিক মানুষদের বিশ্বাস জন্মানোর উদ্দেশ্যেই তা নির্ধারিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, শিশুকে মিশ্রি-ঢাকা ওষুধ খেতে দেওয়া হতেই পারে। মিশ্রি দিয়ে ঢাকা আছে বলেই ওষুধটি শিশু খেতে উৎসাহ পায়, অথচ বয়স্ক মানুষ তার যথার্থ স্বার্থেই ওষুধটি গ্রহণে উৎসাহ বোধ করবে। বৈদিক উপলব্ধির পরিণত পর্যায় সম্পর্কে *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/২২) উল্লেখ করা হয়েছে—*তম্ এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্যেন তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চ।* "বেদশাস্ত্রাদির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ফলে, এবং ব্রহ্মচর্য, প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছ্রতা, ভগবৎ-বিশ্বাস এবং নিয়ন্ত্রিত আহারাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরাই পরমতত্ত্ব অবগত হতে পারেন।" পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, তা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে। যদিও বেদশাস্ত্রাদিতে অনুমোদিত ব্রতপালনাদির সঙ্গে জাগতিক ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তা হলেও সেই সকল কাজকর্মেরই ফল যেহেতু পরমেশ্বরের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাই সে সব কাজই চিন্ময় সত্তাবিশিষ্ট হয়ে উঠে। মিশ্রিতে ঢাকা ওষুধ এবং সাধারণ মিশ্রি দেখতে কিংবা খেতে একই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু মিশ্রিতে ঢাকা ওষুধের যে চিকিৎসা-সার্থকতা আছে, সাধারণ মিশ্রির ক্ষেত্রে সেই গুণটি থাকার দরকার হয় না। ঠিক সেইভাবেই, *নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা এই শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, বৈদিক অনুশাসনাদির বিশ্বস্ত অনুসরণকারী মানুষ অবশ্যই জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা তথা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম অর্জনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হবে, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)।

শ্লোক ৪৭

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥ ৪৭ ॥

যঃ—যে; **আশু**—শীঘ্র; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়ের গ্রন্থি (জড় দেহের সাথে মিথ্যা আত্মপরিচিতি); **নির্জিহীর্ষুঃ**—ছেদনে আগ্রহী; **পরাত্মনঃ**—দিব্য আত্মা; **বিধিনা**—বিবিধ বিধান সহকারে; **উপচরেৎ**—উপাচার সহকারে আরাধনা করা উচিত; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তন্ত্র-উক্তেন**—যা বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে (বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের আনুষঙ্গিক পরিশিষ্টসমূহ যেখানে পারমার্থিক পূজা-অর্চনার বিশদ নির্দেশাবলী আছে); **চ**—আরও (প্রত্যক্ষভাবে *বেদোক্তম্* বিধিনিষেধাদির অতিরিক্ত); **কেশবম্**—ভগবান শ্রীকেশব।

অনুবাদ

চিন্ময় আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখে যে মিথ্যা অহম্ বোধ, সেই বন্ধন দ্রুত ছিন্ন করতে যেব্যক্তি আগ্রহী হন, তিনি তন্ত্রাদির মতো বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিধিনিয়মাদি অবলম্বনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশবের পূজা-আরাধনা অবশ্যই করে থাকেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রাদিতে পরম তত্ত্বের এমন রহস্যময় বর্ণনা আছে, যা থেকে দার্শনিক কল্পনার প্রবণতা জাগে। বৈদিক গ্রন্থাদির মধ্যে ও ধর্মীয় যাগযজ্ঞাদিমূলক উৎসবাদির জন্য স্বর্গীয় সুফল লাভের কথা রয়েছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকে যেভাবে বেদশাস্ত্রাদির জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড বিভাগে উল্লিখিত *বালানাম্ অনুশাসনম্* প্রথা আলোচিত হয়েছে—অর্থাৎ, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তথা শিশুসুলভ মানুষেরা যেহেতু মনগড়া এবং ফলাশ্রয়ী কাজকর্মেই আসক্ত হয়, তাই বেদশাস্ত্রের এই অংশগুলি সেই ধরনের মানুষদেরই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থক পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে তোলার জন্যই বৈদিক অনুশাসনাদির আয়ত্তে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে।

যেহেতু জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষদের জন্য বিভিন্ন শ্লোকে পথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাই এখন এই শ্লোকটিতে *বিজ্ঞঃ* অর্থাৎ, শিক্ষিত দিব্যজ্ঞানীদের জন্য প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ ধরনের দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা যাতে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রীতি সাধনের জন্য *শ্রীনারদপঞ্চরাত্র* প্রমুখ বৈষ্ণব তন্ত্রাবলীর মধ্যে বর্ণিত সুনিয়মবদ্ধ পূজা-অর্চনার বিধি অনুসরণ করতে পারেন, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। *উপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্* শব্দসমষ্টির

দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব নানাপ্রকার বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ভক্তসমাজের আনন্দবিধানের আয়োজন করেছিলেন, তাঁকেই প্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করা উচিত। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁর রচিত দশাবতার স্তোত্রের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশবের দশটি উল্লেখযোগ্য অবতাররূপ, যথা—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কির লীলা বর্ণনা করেছেন। *উপচরেদ্ দেবম্* শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলন বোঝানো হয়েছে। আর তাই *তন্ত্রোক্তেন* অর্থাৎ "তন্ত্রাদির অনুশাসন অনুসারে" শব্দগুলির দ্বারা বুঝতে হবে যে, বৈষ্ণব তন্ত্রাবলী যথা *শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে* বোঝানো হয়েছে, যে গ্রন্থে শ্রীকেশবের আরাধনার উপযোগী বিশদ বিস্তারিত উপদেশাবলী বিধৃত হয়েছে। বেদগ্রন্থাবলীকে *নিগম* উপাধি দ্বারা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর এই সকল *নিগম* বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলে সেইগুলিকে বলা হয় *আগম*, অর্থাৎ তন্ত্র। যখন দিব্য ভাবসম্পন্ন জাগতিক শরীর সম্পর্কিত দ্বৈত আচরণে বিরক্তিকর মানসিকতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন, তখন তিনি বেদ গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর দিব্য মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এই শ্লোকে *আশু* শব্দটির দ্বারা বোঝায় যে, জাগতিক অবস্থানের আশু সমাপ্তি সাধন করে যাঁরা নিজেদের সচ্চিদানন্দময় জীবনধারায় অবস্থিত করতে আকুলতা বোধ করেন, তাঁদের পক্ষে পূর্ববর্তী শ্লোকাদির মধ্যে বর্ণিত প্রারম্ভিক বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের পথ বর্জন করে প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা উচিত।

শ্লোক ৪৮

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

লব্ধা—লাভ করার মাধ্যমে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **আচার্যাৎ**—পারমার্থিক আচার্যদেবের কাছ থেকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সন্দর্শিত**—প্রদর্শিত; **আগমঃ**—বৈষ্ণব-তন্ত্রসমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত আরাধনার প্রক্রিয়াদি; **মহা-পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **অভ্যর্চেৎ**—শিষ্যের পূজা করা উচিত; **মূর্ত্যা**—বিশেষ শ্রীবিগ্রহ রূপে; **অভিমতয়া**—অভিরুচি মতো; **আত্মনঃ**—নিজের।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অনুশাসনাদি শিষ্যের কাছে প্রকাশ করেন যে পারমার্থিক গুরুদেব, তাঁর কৃপালাভের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর নিজের কাছে সর্বাকর্ষক

শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মন্তব্য অনুসারে, *লব্ধানুগ্রহঃ* শব্দটির দ্বারা পারমার্থিক সদ্‌গুরু প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রদান বোঝায়। এই বিষয়ে *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণোবিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাদ্ বৈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥

পারমার্থিক সদ্‌গুরু অবশ্যই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিতপ্রাণ শুদ্ধাত্মা পুরুষ হবেন। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* তাই বলা হয়েছে—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্ ।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

"নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে কেউ যখন বর্জন করে, তখন তার আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে সে কলুষিত করে এবং চরিত্রের ভয়াবহ দুর্বলতা অভিব্যক্ত করে। অবশ্যই ঐ ধরনের মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকেই বর্জন করেছে।" যথার্থ শিষ্যকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই বৈদিক জ্ঞানের সমগ্র উপলব্ধির আগমন সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ লঘুভাবে কিংবা যদিচ্ছাক্রমে পারমার্থিক বৈষ্ণব সদ্‌গুরু গ্রহণ এবং বর্জন করে, কখনও-বা অন্য কোনও পারমার্থিক গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মহা অন্যায়স্বরূপ *বৈষ্ণব-অপরাধে* দোষী হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনও নির্বোধ কনিষ্ঠ ভক্ত ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, শিষ্যের ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যেই পারমার্থিক গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে, এবং তাই পারমার্থিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামে ঐ ধরনের নির্বোধ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুকে ত্যাগ করে থাকে। নিজেকে গুরুর নিত্য দাস বলে মনে করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী অবশ্য *নারদপঞ্চরাত্র* থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥

"কোনও অবৈষ্ণবের দ্বারা মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষকে অবশ্যই নরকগামী হতে হয়। অতএব, কোনও বৈষ্ণব গুরুর মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাকে আবার সঠিকভাবে দীক্ষালাভ করতে হয়।" শিষ্যের যোগ্যতা সযত্নে পরীক্ষা করা

পারমার্থিক গুরুদেবের কর্তব্য, এবং পারমার্থিক সদ্গুরুর কাছে শিষ্যেরও সেইভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। নতুবা, প্রকৃতির বিধি অনুযায়ী নির্বোধ শিষ্য এবং বিচারবুদ্ধিহীন গুরু উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সকল বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের আপাতবিরোধী শাখাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৃত্রিম প্রয়াস করা অনুচিত। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। বদ্ধজীবকুলের বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি রয়েছে, যেগুলি বৈদিক অনুশাসনাদির আপাতবিরোধী *প্রবৃত্তি* এবং *নিবৃত্তিমার্গ* রূপে অভিহিত অনুশাসনাদির মাধ্যমে বিবিধ প্রকার কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বরূপ *অদ্বয়জ্ঞান* নিয়মিতভাবে আরাধনার প্রক্রিয়াই সহজতম পন্থা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে উল্লেখিত সমস্ত দেবতাগণই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে পরিকরাদি মাত্র। দৃষ্টিগোচর জড়জাগতিক পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই শ্রীভগবানের সেবায় নিবেদিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, নতুবা তার কোনই মূল্য নেই। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় প্রয়োজনীয় জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী কৃত্রিম ভাবনায় বর্জন করে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেইভাবে দর্শনের পারমার্থিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী সবই তার নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এমনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। অন্যভাবে বলতে পারা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের আনুকূল্যেই জড়জাগতিক সামগ্রী গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের আদর্শ পন্থা থেকে অধঃপতিত হয়। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—*লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ*—যে পারমার্থিক সদ্গুরু বৈদিক জ্ঞানের সার্থক উপযোগিতা নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে উদ্ঘাটিত করেন, তাঁর কৃপালাভ হলে তখনই মানুষ ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে।

শ্লোক ৪৯

শুচিঃ সম্মুখমাসীন প্রাণসংযমনাদিভিঃ ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪৯ ॥

শুচিঃ—পরিচ্ছন্ন; **সম্মুখম্**—শ্রীবিগ্রহের সন্মুখীন; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **প্রাণ-সংযমন-আদিভিঃ**—প্রাণায়াম (শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম) এবং অন্যান্য উপায়ে; **পিণ্ডম্**—স্থূল দেহ; **বিশোধ্য**—বিশুদ্ধ করার পরে; **সন্ন্যাস**—শরীরের বিভিন্ন স্থানে তিলকের দিব্যচিহ্ন দিয়ে; **কৃত-রক্ষঃ**—এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে রক্ষালাভের প্রার্থনা জানিয়ে; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের পরে, এবং আত্মরক্ষার্থে দেহে পবিত্র তিলক চিহ্ন অঙ্কনের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

শরীরের মধ্যে বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রামাণ্য বৈদিক পদ্ধতি *প্রাণায়াম*। তেমনই, শরীরকে শুদ্ধ করার জন্য ভূতশুদ্ধি প্রামাণ্য প্রক্রিয়া। *শুচিঃ* শব্দটির অর্থ এই যে, কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সকল ক্রিয়াকর্ম সাধন করা উচিত। যদি কোনওভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যহ জপকীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ স্মরণ করতে পারে, তবে জীবনের পরম শুদ্ধতার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তা এই বৈদিক মন্ত্রটিতে বর্ণনা করা হয়েছে—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ (গরুড় পুরাণ)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শরীরে পবিত্র তিলক চিহ্ন দিয়ে, মুদ্রাদি অভ্যাস এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে মানুষ শুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে, তবে মনের মধ্যে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা চিন্তা করতে থাকলে, তার পক্ষে ভগবান শ্রীহরির ভজনা নিতান্তই ব্যর্থ হয়। সুতরাং এখানে *শুচি* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীভগবানকে পবিত্র এবং নিজেকে শ্রীভগবানের সামান্য সেবকরূপে চিন্তা করে অনুকূল মানসিকতায় শ্রীভগবানের আরাধনা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি যার মানসিকতা অনুকূল নয়, তারা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চনা করতে চায় না, এবং তারা অন্য সকলকে শ্রীভগবানের মন্দিরে যেতে নিরুৎসাহিত করে, কারণ তারা মনে করে, শ্রীভগবান যেহেতু সর্বত্র বিদ্যমান, তাই ঐভাবে মন্দিরে গিয়ে পূজা নিবেদনের কোনই প্রয়োজন নেই। ঐ ধরনের ঈর্ষাক্লিষ্ট মানুষ হঠযোগ কিংবা রাজযোগ পদ্ধতি অনুসারে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করা পছন্দ করে। কিন্তু শ্রীভগবান স্বয়ং যা বলেছেন—যেমন, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* এবং *মামেকং শরণং ব্রজ*—তা থেকে বোঝা যায় যে, যথার্থ দিব্য অনুভূতি উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সবকিছুর উৎস এবং তাই তিনিই একমাত্র পূজ্য বিষয়। তাই *পঞ্চরাত্র* প্রথা অনুযায়ী শ্রীভগবৎ-বিগ্রহের পূজা অর্চনা যে সকল ভক্তবৃন্দ সম্পন্ন করেন, তাঁরা ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার যোগ প্রক্রিয়া অনুশীলনে আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ৫০-৫১

অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥ ৫০ ॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ॥ ৫১ ॥

অর্চা-আদৌ—শ্রীঅর্চাবিগ্রহ এবং তাঁর উপকরণাদি সহ; **হৃদয়ে**—অন্তরে; **চ অপি**—আরও; **যথা-লব্ধ**—যা কিছু প্রাপ্তব্য; **উপচারকৈঃ**—আরাধনার উপচারাদি সহ; **দ্রব্য**—অর্পণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী; **ক্ষিতি**—ভূমি; **আত্ম**—নিজ মন; **লিঙ্গানি**—এবং শ্রীবিগ্রহ; **নিষ্পাদ্য**—প্রস্তুত করে; **প্রোক্ষ্য**—শুদ্ধি করণের জন্য জলসিঞ্চন; **চ**—এবং; **আসনম্**—উপবেশনের আসন; **পাদ্য-আদীন্**—শ্রীবিগ্রহের চরণ এবং অন্যান্য অর্ঘ্য উপচারাদি স্নাত করার জল; **উপকল্প্য**—প্রস্তুত হয়ে; **অথ**—অতঃপর; **সন্নিধাপ্য**—যথাস্থানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে; **সমাহিতঃ**—নিজ মন সন্নিবেশ করে; **হৃৎ-আদিভিঃ**—শ্রীবিগ্রহের হৃদয়ে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে; **কৃত-ন্যাসঃ**—পুণ্য তিলক চিহ্নাদি অঙ্কণের মাধ্যমে; **মূল-মন্ত্রেণ**—বিশেষ শ্রীবিগ্রহের অর্চনার উপযোগী যথার্থ মূল মন্ত্রাদির সাহায্যে; **চ**—এবং; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের অর্চনার জন্য যা কিছু উপকরণ প্রয়োজন, সেইগুলি ভক্তের সংগ্রহ করা উচিত, নৈবেদ্য প্রস্তুত করা উচিত, ভূমিতল, তার মন এবং শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করা উচিত, উপবেশনের স্থানে জল সিঞ্চন করে শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন এবং স্নানের জল এবং অন্যান্য উপচারাদি প্রস্তুত করা উচিত। তারপরে ভক্তের শ্রীবিগ্রহটিকে যথাস্থানে যথারূপে এবং যথোপযুক্ত মানসিকতায় স্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তিলকের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের হৃদয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান পবিত্রভাবে অঙ্কন করা উচিত। তারপরে যথাযথ মন্ত্র সহকারে পূজা নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ (*পদ্মপুরাণ*)

সাধারণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে পরম তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মত্ত বদ্ধজীবগণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দিব্য প্রেমময়ী সেবা অভিমুখে সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ হয়ে থাকে। তাদের জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মনগুলি নিত্যনিয়তই অশুচি অশুদ্ধ হয়ে থাকে এবং দারিদ্র

ও সমৃদ্ধি, শীত ও গ্রীষ্ম, যশ ও অপযশ, যৌবন ও বার্ধক্যের মতো জাগতিক দ্বৈতবোধের সীমাহীন ধারাস্রোতে বিব্রত ও বিচলিত হতে থাকে। ঐ ধরনের সদা বিব্রত বদ্ধ জীবগণ কখনই শ্রীবিগ্রহরূপে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। জড়জাগতিক নাম-উপাধিগুলির প্রভাবে সদাসর্বদাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকা জড়বাদী তথা কনিষ্ঠ ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার সবিশেষ অভিব্যক্তি তথা অংশপ্রকাশ স্বরূপ শ্রীভগবানের অর্চাবতার তথা শ্রীবিগ্রহ রূপের অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। তারা শ্রীভগবানকে তাঁর নিত্যধামে প্রত্যক্ষ করতে অপারগ, তাই শ্রীভগবান তাঁর প্রকাশ অবতারাদির অভিব্যক্তির মাধ্যমে এবং স্বয়ং প্রকাশ তথা শ্রীভগবানের স্বয়ং রূপে শ্রীবিগ্রহরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন।

আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের পূজা-আরাধনা যে করে, শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং তাঁর সামনে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। যারা নিতান্তই দুর্ভাগা, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর কৃপাময় শ্রীবিগ্রহ অংশপ্রকাশরূপে চিনতে পারে না। তারা শ্রীবিগ্রহকে নিতান্তই সাধারণ একটি জড় পদার্থ বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু পারমার্থিক সদ্‌গুরু, যিনি শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে মানুষ শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা শিখতে পারে এবং সেইভাবেই শ্রীভগবানের সাথে লুপ্ত সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই ধরনের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আরাধনাকে প্রতিমা পুজা বলে যে মনে করে, সে জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গোলাপী রঙের চশমা লাগিয়ে থাকলে মানুষ সারা জগতটাকেই গোলাপী রঙের দেখে। তেমনই, যে সমস্ত দুর্ভাগা জীব প্রকৃতির জড়াগুণে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন থাকে, তারা পরমেশ্বর ভগবান সমেত সব কিছুকেই তাদের কলুষময় দৃষ্টির মাধ্যমে জড়জাগতিক বিষয় বলেই মনে করতে থাকে।

শ্লোক ৫২-৫৩

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্তিং স্বমন্ত্রতঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৫২ ॥
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥ ৫৩ ॥

স-অঙ্গ—তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; **উপাঙ্গাম্**—এবং তাঁর সবিশেষ দৈহিক বৈচিত্র্যাদি, যথা—তাঁর সুদর্শন চক্র এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি; **স-পার্ষদাম্**—তাঁর পার্ষদবর্গ সহ; **তাম্ তাম্**—প্রত্যেকটি বিষয়ে; **মূর্তিম্**—শ্রীবিগ্রহ; **স্ব-মন্ত্রতঃ**—

শ্রীবিগ্রহের নিজ মন্ত্র; **পাদ্য**—পাদ্য অর্ঘ্যের জল; **অর্ঘ্য**—সুবাসিত অর্ঘ্য জল; **আচমনীয়**—মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল; **আদ্যৈঃ**—এবং ইত্যাদি; **স্নান**—স্নানের জল; **বাসঃ**—সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি; **বিভূষণৈঃ**—অলঙ্কার-ভূষণাদি; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্যসহ; **মাল্য**—গলমাল্য; **অক্ষত**—পূর্ণ শস্যাদানা; **স্রগ্‌ভিঃ**—এবং পুষ্পমাল্যাদি; **ধূপ**—সুগন্ধি ধূপ; **দীপ**—এবং প্রদীপ; **উপহারকৈঃ**—ঐ ধরনের নৈবেদ্য সহ; **স-অঙ্গম্**—সর্ব বিষয়ে; **সম্পূজ্য**—পূজা সমাপন করে; **বিধিবৎ**—অনুমোদিত বিধি অনুসারে; **স্তবৈঃ স্তুত্বা**—প্রার্থনাদি নিবেদনের মাধ্যমে পূজা; **নমেৎ**—দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত; **হরিম্**—শ্রীভগবানকে।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের দিব্য শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ, তাঁর সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রশস্ত্রসহ, তাঁর অন্যান্য উপাঙ্গ বৈচিত্র্য সহ এবং তাঁর পার্ষদবর্গসমেত সকল বিষয়েই পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত। নিজ মন্ত্র সহকারে শ্রীভগবানের এই সকল দিব্য আভরণের প্রত্যেকটির আরাধনা করতে হয় এবং সেই সঙ্গে পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়, সুগন্ধি জল, মুখ প্রক্ষালনের জল, স্নানের জন্য জল সূক্ষ্ম বস্ত্রাভরণ ও অলঙ্কারাদি, সুগন্ধি তৈলাদি, মূল্যবান কণ্ঠহারসমূহ, পূর্ণ শস্যাদানা, পুষ্পমাল্যাদি, সুগন্ধি ধূপ এবং দীপমালা অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে ঐভাবে সকল বিষয়ে পূজা সমাপন করে, ভগবান শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন সহকারে প্রার্থনাদি জানিয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *অক্ষত* শস্যাদানা (৫৩ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত) শ্রীবিগ্রহের তিলক সজ্জা প্রকরণে ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলি ঠিক পূজার জন্য নয়। *নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্*—"শ্রীবিষ্ণুকে পূর্ণ শস্য সহ পূজা নিবেদন করা অনুচিত, এবং শ্রীশিবকে কেতকী পুষ্পাদির দ্বারা আরাধনা করা উচিত নয়।"

শ্লোক ৫৪

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥ ৫৪ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **তৎ**—শ্রীভগবানে; **ময়ম্**—তন্ময় হয়ে; **ধ্যায়ন্**—সেইভাবে ধ্যানস্থ হয়ে; **মূর্তিম্**—স্বীয় রূপ; **সম্পূজয়েৎ**—পরিপূর্ণভাবে পূজা করা উচিত; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **শেষাম্**—পূজার অবশিষ্ট; **আধায়**—গ্রহণ করে; **শিরসা**—নিজ মস্তকে; **স্ব-ধাম্নি**—তাঁর ধামে; **উদ্বাস্য**—স্থাপন করে; **সৎ-কৃতম্**—শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

নিজেকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বিবেচনা করে পূজারীকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে এবং শ্রীবিগ্রহ তাঁর অন্তরেও অবস্থান করছেন, তা স্মরণ করে যথার্থভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করতে হয়। তারপরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনার উপকরণাদি তথা নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশ, যথা, পুষ্পমাল্য, তাঁর মাথায় ধারণ করতে হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিগ্রহ তাঁর যথাস্থানে স্থাপন করে, পূজা সমাপন করতে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *তন্ময়ম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে যিনি শুদ্ধতা অর্জন করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি পূজারীরূপে শ্রীভগবানের নিত্যদাস এবং শ্রীভগবানের সাথে গুণগতভাবে একাত্ম, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান যেন অগ্নির উৎস এবং আরাধনাকারী ভক্ত সেই অগ্নির একটি সামান্য অগ্নিকণা মাত্র। শ্রীল মধ্বাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

বিষ্ণোর্ভৃত্যোঽহম্ ইত্যেব সদা স্যাদ্ ভগবান্ময়ঃ।
নৈবাহং বিষ্ণুরস্মীতি বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরোহ্যজঃ ॥

"চিন্তা করা উচিত যে, 'আমি শ্রীবিষ্ণুর নিত্যদাস, এবং তাই আমি তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ, আমি তাঁর নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু আমি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু নই, কারণ শ্রীবিষ্ণু সব কিছুর পরম নিয়ন্তা।"

শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মূল নীতি এই যে, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিত্য সেবক রূপে নিজেকে বিবেচনা করতে হয়। বাহ্যিক জড়জাগতিক শরীরের সঙ্গে মূর্খের মতো আত্মপরিচয় জ্ঞান অনুভবের মাধ্যমে যেজন মৈথুনাসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগে মত্ত হয়, সে নিজেকে ভক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভোগ্য বিষয় মনে করবার ধারণায় মানসিক পরিবর্তন করতে না পেরে ভোগী মনোবৃত্তি পোষণ করতেই থাকে। সেই ধরনের মানুষ *তন্ময়ম্* শব্দটির এমনই অর্থবোধ প্রতিপন্ন করে যেন সে নিজেই আরাধ্য বিষয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর *দুর্গসঙ্গমনী* নামক রচনায় শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, *অহংগ্রহোপাসনা,* অর্থাৎ নিজেকে পরম পুরুষরূপে আরাধনার পদ্ধতি নিতান্তই নিজের সঙ্গে পরম তত্ত্বের ভ্রান্ত আত্মপরিচিতি মাত্র, কারণ পরম পুরুষ প্রকৃতপক্ষে সকল জীবের পরম নিত্য আশ্রয়তত্ত্ব। ষড় গোস্বামীগণ বারংবার এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধিহীন লোকেরা মায়াবাদী দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারণাদির ফলে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাই মায়াচ্ছন্ন ভ্রান্ত মতবাদ অভিব্যক্ত করে যে, আরাধনাকারীই পরম আশ্রয়

হয়ে উঠে। ঐ ধরনের ভ্রান্তিবোধ শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ। তাই, এই শ্লোকে *তন্ময়* শব্দটিতে ভ্রান্তিবশত ভুল বোঝা উচিত নয় যে, এর অর্থ বুঝি আরাধনাকারী তার আরাধ্য বস্তুর সমকক্ষ হয়ে উঠে।

শ্লোক ৫৫

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥ ৫৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **অর্ক**—সূর্য; **তোয়**—জল; **আদৌ**—এবং এইভাবে; **অতিথৌ**—কারও গৃহে অতিথি রূপে; **হৃদয়ে**—কারও হৃদয়ে; **চ**—আরও; **যঃ**—যে; **যজতি**—পূজা করে; **ঈশ্বরম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অচিরাৎ**—অনতিবিলম্বে; **মুচ্যতে**—মুক্তিলাভ করে; **হি**—অবশ্যই; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীভগবানের আরাধনাকারীর উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী সত্তা এবং সেই কারণে তাঁকে অগ্নি, সূর্য, জল এবং অন্যান্য সকল উপাদানের মধ্যে, গৃহে আগত অতিথির হৃদয়ের মধ্যে, এবং নিজ হৃদয়েরও মাঝে আরাধনা করা উচিত। এইভাবেই আরাধনাকারী অচিরে মুক্তিলাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।